বুলেট

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৩৭১ সন

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
৫৯৫ সারকুলার রোড
হাওড়া-৪

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং
রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

মুদ্রক
সোমা প্রিণ্টার্স
৩৬ এন. রোড
হাওড়া-৮

দোল আসছে। আর মাত্র কয়েক দিন বাকি। আমাদের স্কুলটা গঙ্গার ারেই। তেমন বড় না হলেও একটা মাঠ আছে। চারপাশ পাঁচিল ঘেরা। ুটো বড় শিশু গাছ আছে। ইংরেজ আমলের বাড়ি। সেই বাড়িটার পাশে নতুন একটা ব্লক তৈরি হয়েছে। কেমন যেন বেমানান! পুরনো বাড়িটার আলাদা একটা ইজ্জত। সামনেই গাড়িবারান্দা। বড়-বড় সিঁড়ি। তারপর করিডর। দু'পাশে ক্লাস রুম। সোজা গেলে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি, ছোট ছোট ধাপ। তিন বাঁক বেঁকে দোতলায় গিয়ে উঠেছে। নীচের করিডর বাঁয়ে বেঁকে পশ্চিমের ওই মাঠে গিয়ে পড়েছে। পাঁচিলের পরে রাস্তা। রাস্তার পরেই গঙ্গা।

নীচেটা একটু অন্ধকার-অন্ধকার হলেও গরম কালে ভারী ঠাণ্ডা। বেশ মিষ্টি হাওয়া আসে গঙ্গার দিক থেকে, জলের গন্ধ, পলির গন্ধ নিয়ে। খড় পচার গন্ধ। বট-অশ্বত্থের পাতা বাতাসের সঙ্গে খেলা করে, তার শব্দ। স্টিমারের শব্দ। ঘাটের পাশে সার-সার নৌকো বাঁধা। মাঝি-মাল্লাদের হইচই। স্কুলটা যেন স্বপ্নের মতো। 'তোমাদের স্কুল' যদি রচনা লিখতে দেয়, কত কী যে লিখতে ারি! দোতলায় হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘর। সেই ঘরে বার্মা কাঠের কালো পালিশ করা বিরাট টেবিল। বড়-বড় চেয়ার। গম্ভীর মুখে বসে আছেন তিনি।

শীতের সময় ধুতির ওপর গাঢ় নীল রঙের কোট পরেন। পেছনের দিকের জানালাটা সবসময় বন্ধই থাকে। পশ্চিমের গঙ্গার দিকের জানালা খোলা। রোদ ঝলমলে গঙ্গা, নৌকো, পাল মাঝে-মাঝে তিনি সেই দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন। আমাদের হেডমাস্টার মশাই বিরাট পণ্ডিত। কোনও পরীক্ষায় দ্বিতীয় হন নি। সবেতেই প্রথম। ইংরেজিতে কবিতা লেখেন। ঘরের দেওয়ালে বড়-বড় ছবি, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল, শরৎচন্দ্র। ওই ঘরটায় আমি একদিনই ঢুকেছিলুম। ভর্তি হওয়ার দিন আমার দাদু আমাকে নিয়ে এসেছিলেন। হেডমাস্টার মশাই আমার ওর‍্যাল পরীক্ষা নিয়েছিলেন। ট্রান্সস্লেশন, মুখে-মুখে দু-একটা অংক। একটা কবিতা আবৃত্তি করতে বলেছিলেন। সবই ঠিক-ঠিক পেরেছিলুম। তিনি বলেছিলেন, 'গুড, ভেরি গুড।' আমাকে ভর্তি করে নিয়েছিলেন। সেই একদিনের দেখা। কেবলই মনে হত, আবার কবে দেখব! তিন আলমারি—ঠাসা বই। চামড়া বাঁধানো, সোনার জলে নাম লেখা। মা-সরস্বতী এইরকম ঘরেই থাকেন। কখনও-সখনও দরজার বাইরে থেকে উঁকি মেরে দেখতুম। সোনার কলমে মোটা খাতায় হেডমাস্টার মশাই খসখস করে লিখছেন। টেবিলের ওপর ফুলদানিতে লাল, সাদা, হলদে ফুল। পিছনের দেওয়ালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছবি।

হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘরের লাগোয়া হলঘরে লাইব্রেরি। লম্বা টেবিল অনেক চেয়ার। এই ঘরেই মাস্টার মশাইরা ক্লাসের অবসরে বসেন। এই ঘরেই কমিটি মিটিং হয়। তার পাশেই তিন তলার ছাদে যাওয়ার সিঁড়ি। ছাদে আমরা বছরে একবারই যেতে পাই। স্বাধীনতা দিবসের দিন। সেইদিন ছাদে পতাকা তোলা হয়। ছাদটা খেলার মাঠের মতোই বড়। কেয়ারি করা আলসে। ডিঙি মেরে দেখলে গঙ্গার এপার-ওপার, দুপারই দেখা যায়। ছাদের দুটো ঘর তালাবন্ধই থাকে। ভেতরে কে আছে, কী আছে কেউ জানে না। ভূত থাকলেও থাকতে পারে। আমরা যখন বাড়ি চলে যাই স্কুলবাড়িটা একেবারে নির্জন হয়ে যায়। শিশু গাছের উঁচু ডালে বসে চ্যাঁ-চ্যাঁ করে পেঁচা ডাকে। হুসহুস হাওয়া আসে গঙ্গার দিক থেকে। তখন ওই ছাদে ভূত না এসে পারে! আমাদের স্কুলের দারোয়ানের গভীর বিশ্বাস, স্কুলের ছাদে ভূত আছে। আর সেই ভূত খুব লেখাপড়া জানে। ইংরেজি ধাতুরূপ আওড়ায়। ডু, ডিড, ডান, গো, ওয়েন্ট, গন, কাম, কেম, কাম। নীচের ঘর থেকে সে সব স্পষ্ট শোনা যায়। সকলেরই ধারণা, আমাদের ইংরেজির শিক্ষক জীবনধন বাবু এখনও

স্কুলের মায়া ছাড়তে পারেন নি। তিনি আমাদের খুব ভালবাসতেন, আমরাও তাঁকে খুব ভালবাসতুম। পাকা পেয়ারার মতো গায়ের রং। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। খদ্দরের ধুতি, পাঞ্জাবি। সব সময় মুখে একটা হাসি লেগে থাকত। তিনি হঠাৎ মারা গেলেন। বলা নেই কওয়া নেই একদিন সকালে খবর এল, তিনি চলে গেছেন। স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। শোকসভা হল। আমাদের মধ্যে রুপেন খুব ভাবুক ধরনের। ফর্সা রং, বড়-বড় চোখ। কথায়-কথায় কেঁদে ফেলে। রুপেন খুব খানিক কাঁদল। শোকসভার শেষে গঙ্গার পারঘাটে বসে আমাদের গান শোনাল কান্না-জড়ানো গলায়, আছে দুঃখ আছে মৃত্যু। খুব ভাল গান গায় রুপেন। দু'চোখে জলের ধারা। রুপেনটা ওই রকম। বসন্তকালে গাছে কচি-কচি সবুজ পাতা এসেছে, রুপেনের চোখে জল। দ্যাখ, দ্যাখ, কী সুন্দর, বলছে আর দু'চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। শিশু গাছের ডাল থেকে ঝড়ে পাখির বাসা পড়ে গেছে, রুপেন নিজের জীবন তুচ্ছ করে গাছে উঠছে বাসাটাকে ঠিক জায়গায় বসিয়ে আসতে। ছেলেরা চিৎকার করছে, মাস্টারমশাইরা চিৎকার করছেন, 'ওরে রুপেন, পড়ে গেলে আর বাঁচবি না।' কে কার কথা শোনে! জীবনধন বাবু এইসব কারণেই রুপেনকে খুব ভালবাসতেন। বলতেন, 'এই ছেলেটা সংসারে কিছু করতে পারবে না ঠিকই, তবে যদি সন্ন্যাসী হয়, সমাজের অনেক কল্যাণ হবে। এর হৃদয়টা সোনার। গোল্ডেন হার্ট।' তিনি সেদিন আমাদের সেই গল্পটা বলেছিলেন, অস্কার ওয়াইল্ডের, 'দি হ্যাপি প্রিন্স', সোনার পাতে মোড়া প্রিন্সের স্ট্যাচু সোয়ালো পাখিকে বলছে, 'আমি যখন জীবিত ছিলুম, আমার যখন মানুষের হৃদয় ছিল, তখন আমি জানতুম না, চোখের জল কাকে বলে। তখন আমি বাস করতুম বিশাল এক রাজপ্রাসাদে। সেখানে কোনও দুঃখের স্থান ছিল না। দিনের বেলা আমি আমার সঙ্গীদের সঙ্গে প্রাসাদের বাগানে খেলা করতুম। সন্ধেবেলা প্রাসাদের হলঘরে আমার নাচের দল নিয়ে নাচগান করতুম। বাগানের চারপাশ ঘেরা ছিল উঁচু পাঁচিল। ওপাশে কী আছে জানার ইচ্ছেও হত না, জিজ্ঞেসও করি নি কাউকে। কারণ আমার নিজের জীবন ছিল সুন্দর, সুখে ভরা। প্রাসাদের সবাই আমাকে বলত, হ্যাপি প্রিন্স। সত্যিই আমি সুখী ছিলুম, ভোগে আর আনন্দে থাকাটাই যদি জীবনের সুখ হয়! এইভাবেই আমি বেঁচে ছিলুম আর এইভাবেই একদিন মরেও গেলুম। আর আমার মৃত্যুর পর ওরা করল কী, আমার একটা মূর্তি তৈরি করে এমন উঁচুতে দাঁড়

করিয়ে রেখেছে যে, আমি আমার নগরের সমস্ত কদর্যতা, সমস্ত দারিদ্র্যের ছবি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। আমার মূর্তির হৃদয়টা সিসের তৈরি হলেও, আমি না কেঁদে পারছি না।'

জীবনধন বাবু যখন গল্প বলতেন, তখন আমাদের সব ছটফটানি বন্ধ হয়ে যেত। তিনি বলতে লাগলেন, কী ভাবে হ্যাপি প্রিন্স তার বন্ধু সোয়ালো পাখিকে দিয়ে প্রথমে তার তরবারির হাতলের চুনি পাথরটাকে পাঠিয়ে দিল এক বৃদ্ধা দরজির কাছে। সেই বর্ণনাটা কী সুন্দর। 'পাখি! ওই দ্যাখো, দূরে, বহু দূরে, ছোট্ট একটা গলিতে জীর্ণ একটা বাড়ি। পাখি! আমি দেখতে পাচ্ছি, একটা খোলা জানালা। একটা টেবিল। বসে আছেন এক মহিলা। অনাহারে, পরিশ্রমে শীর্ণ। সারা মুখে অসীম ক্লান্তির ছাপ। হাতের চামড়া পুরু হয়ে গেছে, সূচ ফুটে-ফুটে দগদগে লাল। সারাদিন তাঁকে সেলাই করতে হয়। এই মুহূর্তে তিনি একটা সাটিনের গাউনে ফুলের নকশা তোলার কাজে ব্যস্ত। রাজবাড়ির বল নাচে রানীর প্রিয় পরিচারিকাদের মধ্যে সবচেয়ে যে সুন্দরী, এই গাউনটা পরে সে নাচবে। আর ওই দ্যাখো ঘরের কোণে বিছানায় শুয়ে আছে তাঁর ছেলে। শিশুটি অসুস্থ। জ্বর হয়েছে, অনেকক্ষণ ধরে একটা কমলালেবু চাইছিল। ছেলেটিকে নদীর জল ছাড়া আর কিছুই দেওয়ার মতো নেই তার মায়ের কাছে। ছেলেটি তাই কাঁদছে। 'পাখি, পাখি, আমার ছোট্ট পাখি, তুমি কি এই চুনিটা আমার হয়ে ওকে দিয়ে আসতে পারো না? আমার যে নড়ার উপায় নেই। আমাকে যে বেদির ওপর গেঁথে রেখে গেছে?' পাখি ঠোঁটে করে সেই চুনিটা নিয়ে উড়ে গেল। হ্যাপি প্রিন্সের চোখ দুটোয় বসানো ছিল মরকত মণি! পাখিকে দিয়ে সে-দুটোও দান করে দিল। গায়ের সোনার পাতগুলোও দান হয়ে গেল। পাখি ভেবেছিল, ভয়ংকর শীত আসার আগেই সে উড়ে চলে যাবে গরমের দেশ মিশরে। যেখানে সোনালি বালির ওপর সিংহ খেলা করে। গরম নীল আকাশে খেজুর পাতা মাথা দোলায়। পিরামিডের মাথার ওপর বসে থাকে নীল পাখি। তার দলের অন্য পাখিরা সব চলে গেছে। সেই কেবল বাঁধা পড়ে গেছে হৃদয়ের বন্ধনে। সব যখন দেওয়া হয়ে গেছে সোয়ালো তখন বলল, 'প্রিন্স, আমি তা হলে এইবার আসি।' চারপাশ বরফে সাদা। ছোট্ট সোয়ালো শীতে কাঁপছে। হ্যাপি প্রিন্স বলল, 'হ্যাঁ ভাই, তোমাকে আমি অনেকদিন আটকে রেখেছি, যাও, এইবার তুমি চলে যাও নীলনদের দেশে!' সোয়ালো বলল, 'প্রিন্স আমার আর ওড়ার

শক্তি নেই, ঠাণ্ডায় আমার ভেতরটা জমে আসছে, আমি তোমার কাছে চির বিদায় চাইছি। আমি সেই দেশে যাচ্ছি যেখান থেকে কেউ ফেরে না।' কথা শেষ হওয়া মাত্রই সোয়ালো মরে কাঠ হয়ে প্রিন্সের পায়ের কাছে পড়ে গেল। আর হ্যাপি প্রিন্সের সিসের হৃদয় শব্দ করে ফেটে গেল। শহরের মেয়র বললেন, 'এ কী! সুন্দর মূর্তির এ কী দশা! চোখ দুটো অন্ধ। শরীরটা কালো। এই কুৎসিত মূর্তি তো এই শহরে রাখা যায় না। সরাও, সরাও! ওখানে আমার মূর্তি বসবে।' লোকজন এসে গেল। মূর্তি নামাতে গিয়ে দেখা গেল, পায়ের কাছে মরে পড়ে আছে ছোট্ট পাখি। সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল আবর্জনায়। এইবার মূর্তিটাকে গলানো হচ্ছে। সবটাই সহজে গলে গেল, গলল না কিছুতেই হৃদয়টা। মেয়র বললেন, 'ওটাকেও ফেলে দাও আবর্জনায়।' ভগবান তাঁর এক দেবদূতকে বললেন, 'যাও, ওই নগরের সবচেয়ে মূল্যবান দুটো জিনিস আমাকে এনে দাও!' দেবদূত তাঁকে এনে দিলেন ওই দুটো জিনিস, সিসের হৃদয় আর মৃত পাখি। ভগবান বললেন, 'ঠিক জিনিস এনেছ, স্বর্গের উদ্যানে এই ছোট্ট পাখি চিরকাল গান গাইবে, আর আমার সোনার নগরে প্রতিষ্ঠিত হবে হ্যাপি প্রিন্স।'

গল্প বলতে বলতে জীবনধন বাবুর চোখ ছলছল করে উঠেছিল। সবশেষে বলেছিলেন, 'রুপেন আমাদের হ্যাপি প্রিন্স। এত দয়া, এত মায়া ক'জনের আছে?' সেই জীবনধন বাবু মারা যাওয়ার পর রুপেন কেমন যেন হয়ে গেছে। তার ইচ্ছে, শিশু গাছের তলায় তাঁর একটা সমাধি করবে। সে তো আর হয় না; স্কুল কেন করতে দেবে!

আমরা চার জন সেকেণ্ড বেঞ্চে বসি, আমি, রুপেন, সৌমিত্র, আর শুভেন। সৌমিত্র একটু অন্য ধরনের ছেলে। খুব ভাল ফুটবল খেলে। শুভেন খুব গম্ভীর প্রকৃতির। লেখাপড়ায় খুব ভাল। ভারী-ভারী কথা বলে। ভারী-ভারী বই পড়ে। আমাদের ফার্স্ট বয়ের সঙ্গে কম্পিটিশন চলছে। শুভেনকে আমরা খুব ব্যাক করছি। সে আমাদের গ্রুপের। ফার্স্ট বয় অনিমেষের ভীষণ ডাঁট। আমাদের দিকে করুণার চোখে তাকায়। অনিমেষের দাদা আমেরিকায় পড়তে গেছে। অনিমেষও যে যাবে, সেই কথাটা সুযোগ পেলেই শোনায়। ওর কিছু চেলা আছে, আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে তাদের সঙ্গে খুব চালের কথা বলে। নায়াগ্রা ফলস থেকে দাদা কার্ড পাঠিয়েছে। একটি ভুটপেন পাঠিয়েছে, যার মুখে আলো জ্বলে। আমেরিকায় কেউ পায়ে হাঁটে

না। সবাই বড়-বড় গাড়ি চাপে। টিফিনের সময় স্যাণ্ডউইচ খায়, আবার বলে, 'আমার অ্যামেরিক্যান হ্যাবিট। দিনের বেলায় ভাত খেতে পারি না, একটা হেভি ব্রেকফাস্ট করি, আর ডিনারে ভাত। সেই খাওয়াটাই বেশ জমিয়ে খাই।'

রুপেন মাঝে-মাঝে বলে, 'বড়লোক হওয়ার কী কষ্ট! সব সময় বড়-বড় কথা বলতে হবে, সহজ ভাবে কারও সঙ্গে মেলামেশা করা যাবে না। হাসা যাবে না। দেখবি, ও খুব বড় লোক হবে তবে ভাল লোক হবে না। কেউ ওকে ভালবাসবে না।'

ওই যে বলেছিলুম, আর কয়েকদিন পরেই দোল। দোল আমাদের গ্রুপের চারজনেরই ভাল লাগে না। মনে হয় ভয়ংকর অসভ্যতা। আমাদের ভাল লাগে দোলের আগের দিন ন্যাড়াপোড়া। আমরা আমাদের খেলার মাঠে বাঁশ, চেঁচারি, খড়, শুকনো ডালপালা, শুকনো নারকোল পাতা, যা পাই সব জোগাড় করে আনি, সব এক জায়গায় জড়ো করা হয়। মাথার ওপর বসানো হয় একটা বেল। আকাশে থালার মতো একটা চাঁদ। রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে আরতির কাঁসর ঘণ্টা। আর ঠিক সেই সময় দাউ-দাউ আগুন। সে কী ভয়ংকর শক্তি আর তেজ! আগুনের শিখার অদ্ভুত একটা ধকধক আওয়াজ আছে। জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাওয়ার শব্দ। আগুনের সামনে যারা দাঁড়িয়ে থাকে, পেছন দিক থেকে তাদের কেমন যেন অসহায় দেখায়! এতটুকু-টুকু কালো পুতুলের মতো। মনে হয়, জোরে হাওয়া দিলে সব ছাই হয়ে উড়ে যাবে। আগুন লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠছে, একতলা, দোতলা, গরম বাতাস হালকা হয়ে উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে। বাঁশে চিড় ধরার শব্দ। এক সময় বেলটা ফট করে ফেটে যায়। আগুন ক্রমশ কমে আসে। ফুলকি ওড়ে। ছাইয়ের স্তূপে আগুনের রেখা কিলবিল করে। আমরা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। কিছু দাহ্য পদার্থ, সামান্য আগুনের স্পর্শ, এক মহা প্রলয়। এই শক্তিটা দেখতে আমাদের ভাল লাগে, আগুন আমাদের পবিত্র করে। সব নিভে যাওয়ার পর মাঠ ভর্তি নরম চাঁদের আলো। ফাল্গুনের কোকিল কাতর সুরে ডাকছে। রং কলের কোয়ার্টারে বিহারিরা ঢোল বাজিয়ে হোলির গান গাইছে। এই পর্যন্ত বেশ ভাল, বাকিটা সব খারাপ।

আমাদের ক্লাস সেভেন নীচের তলার পশ্চিমের ঘরে হয়। মাঠের দিকের দরজাটা খোলা থাকে। আলো আসবে বলে। জীবনধন বাবু মারা যাওয়ার

পর থেকে হেডমাস্টার মশাই আমাদের ইংরেজির ক্লাস নিচ্ছেন। তাঁর নেওয়ার কথা নয়। হেডমাস্টার মশাই ক্লাস টেনের নীচে নামবেন না, এইটাই নিয়ম। মাস্টার মশাই সবে ক্লাসে এসেছেন। ধবধবে ধুতি-পাঞ্জাবি! ডাস্টারটা টেবিলে রেখেছেন, চকটা গড়িয়ে যাচ্ছিল, সেটাকে সবে সামলেছেন, এমন সময় পশ্চিমের খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল সৈকত। আমাদের ক্লাসের সেই ভয়ংকর দুষ্টু ছেলেটা। তার আসল নাম হারিয়ে গেছে। সবাই তাকে বুলেট বলে ডাকে। রোদের বিপরীতে বুলেটকে মনে হচ্ছে ব্রোঞ্জের মূর্তি। বুলেটের হাতে একটা কী রয়েছে! বেশ বড় একটা পেতলের কৌটোর মতো কী? হঠাৎ ফিশ করে একটা শব্দ হল আর সারা ঘরে যেন বৃষ্টি হচ্ছে। হেডমাস্টার মশায়ের সাদা পাঞ্জাবি লাল হয়ে গেল। আমরাও সব লালে লাল। বুলেট একটা স্প্রেয়ার নিয়ে এসেছে। দোল পর্যন্ত বেশ একটা শীত-শীত ভাব থাকে। জলের ধারা ছ্যাঁক-ছ্যাঁক করে আমাদের গায়ে লাগছে। হেডমাস্টার মশাই আমাদের মনিটরকে বললেন, 'ওকে জাপটে ধরে আন।' বলাই আমাদের মনিটর। সে একলাফে এগিয়ে গেল। বুলেট ছুটে পালাল। হইহই করে আমারও দৌড়লুম। পাশের ঘরে ইতিহাসের ক্লাস নিতে এসেছিলেন হর্ষবাবু। ভাল ফুটবল খেলতেন এক সময়। তিনিও ছুটে এলেন। একঘর লাল ছেলে দেখে অবাক! বুলেটকে ধরা গেল না। আমাদের রঙে চুবিয়ে দিয়ে হাওয়া হয়ে গেল।

হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘরে শিক্ষক মশাইদের জরুরি মিটিং বসে গেল। বুলেটকে আর ক্ষমা করা যায় না। বাংলার শিক্ষক মশাই বললেন, 'ও ছাদের আলসের পাশ থেকে ছোট পাথর ছুড়ে তিন মাস আগে আমার চশমার কাঁচ ভেঙেছিল। সেইদিন আমার ডান চোখটা কানা হয়েও যেতে পারত! গাধার টুপি মাথায় দিয়ে ক্লাসে-ক্লাসে ঘোরানো হয়েছিল। গাধার মাথায় গাধার টুপি চাপালে গাধার কি আক্কেল হয়!'

ভূগোলের শিক্ষক মশাই বললেন, 'ও আমার গ্লোবটা নিয়ে একদিন ফুটবল খেলেছিল। দক্ষিণ গোলার্ধটা একেবারে ড্যামেজ হয়ে গেছে। কোনও দেশের নামই আর পড়া যাচ্ছে না। সারাদিন ওকে নিল ডাউন করে রাখা হয়েছিল। রাখলে কী হবে! যে-ছেলে বছরে একদিনও বসার চান্স পায় না, নিল ডাউনে তার কী হবে! শালগ্রামের শোওয়া আর বসা!'

সংস্কৃতের পণ্ডিত মশাই বললেন, 'ও একেবারে শাস্ত্রোক্ত শয়তান। আমারই নস্যির ডিবে থেকে নস্যি নিয়ে আমারই নাকে গুঁজে দেয়।',

অঙ্কের সার বললেন, 'সেটা কী করে সম্ভব হয়! তার মানে, আপনি ক্লাসে ঘুমোন!'

হেডমাস্টার মশাই বললেন, 'সেটা পরের কথা, আগেরটা আগে ধরুন। অপরাধীর অপরাধের তালিকাটা একবার দেখুন। ক্রমশই লম্বা হচ্ছে। ইন দিস কানেকশান আমার একটা গল্প মনে পড়ছে। এক রাজা বিশ্বস্ত একজন প্রহরী চেয়েছিলেন। একজনকে পাওয়া গেল। মাইনে ঠিক হল তিন হাজার। সারা রাত রাজাকে পাহারা দেবে। একদিন সকলে রাজা বললেন, 'আমি আজ আমার পাশের তালুকে যাব, কারণ আছে।' প্রহরী বলল, 'রাজা-মশাই, আপনি যাবেন না, গেলে বিপদ হবে, আমি কাল স্বপ্ন দেখেছি, আর আমার স্বপ্ন কখনও মিথ্যে হয় না। রাজামশাই প্রহরীর নির্দেশ মেনে সফরে গেলেন না, আর দেখা গেল, রাজামশাই যদি যেতেন তা হলে তার প্রাণসংশয় হত। প্রহরী বলল, 'মহারাজ, দেখলেন তো আমি আপনাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচালুম, আমার পুরস্কার?' রাজামশাই প্রহরীকে দশহাজার টাকার একটা তোড়া দিয়ে বললেন, 'এই তোমার পুরস্কার, তবে কাল থেকে তোমার চাকরিটা আর রইল না।' প্রহরী বলল, 'সে কী কথা মহারাজ?' মহারাজ বললেন, 'কারণটা তুমি বুঝে নাও।'···

হেডমাস্টার মশাই বললেন, 'কারণটা কী বলুন তো?'

সকলেই বেশ একটু চিন্তায় পড়লেন, সত্যিই তো, কারণটা কী! রাজার প্রাণ বাঁচাবার কারণে পদোন্নতি হওয়ার কথা, তা না. চাকরিটাই চলে গেল। পণ্ডিত মশাই-ই উত্তরটা দিলেন। ঘাড় দুলিয়ে হেসে বললেন, 'বুঝতে পেরেছি এ গল্প আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলা হল। প্রহরীর কাজ, রাতে জেগে থেকে পাহারা দেওয়া, যে জেগে থাকে সে স্বপ্ন দেখে কেমন করে! অনুরূপভাবে, যে জেগে থাকে তার সামনে থেকে নস্যির পাত্র চুরি যায় কেমন করে! কাহিনীর ইঙ্গিতের উত্তরে জানাই, সংস্কৃত নিদ্রিত বলেই দেশব্যাপী ইংরেজির এই মহা-জাগরণ। চিরনিদ্রার কাল সমাসন্ন।'

প্রধানশিক্ষকের চেয়ে সহ-প্রধান আরও গম্ভীর। তাঁর সবচেয়ে বড় সমস্যা দাঁত। অমন একজন ভাল শিক্ষক, সারাটা বছরই দাঁত নিয়ে নাকাল। ওঁর কাছ থেকেই আমরা সব দাঁতের নাম শিখে গেছি। বুঝলে, আজ ক্যানাইন

টুথটা খুব ট্রাবল দিচ্ছে। এনামেলটা নষ্ট হয়ে গেছে। পরের দিন বললেন, থার্ড মোলার, এনিমি নাম্বার ওয়ান। একদিন আমাদের সামনেই হেডমাস্টার মশাই বলেছিলেন, 'সবকটাকে তুলে সাবাড় করে দিন না। দুষ্টু গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।'

হেডমাস্টার মশাইয়ের কথা শুনে হেসে বলেছিলেন, 'পঞ্চাশটা বছর ধরে লালন পালন করছি স্যার, কত ভালমন্দ খাবার খেতে আমাকে সাহায্য করেছে, আজ তারা অসুস্থ হয়েছে বলে ত্যাগ করব! এ আপনি কী বিলিতি কথা বলছেন! একস্ট্রাকশান একটা একস্ট্রিম মেথড। সারারাত আমাকে জাগিয়ে রাখে, তাই না আমি দেশ-বিদেশের কত বই পড়তে পারি! জানবেন, সব খারাপেরই একটা ভাল দিক আছে, সব ভালরই একটা খারাপ দিক। এই দাঁতের জন্যেই আমি আজ ডক্টরেট।'

হেডমাস্টার মশাই অবাধ্যতা একেবারে সহ্য করতে পারেন না। না আমাদের, না শিক্ষক মশাইদের। সব শুনে বললেন, 'যা ভাল বোঝেন তাই করুন। পরে বুঝবেন, গরিবের কথা বাসী হলে মিষ্টি লাগে।' সেই একদিনই তাঁকে একটু ফিচিক করে হাসতে দেখেছিলুম। হাসলে মানুষটাকে ভারী সুন্দর দেখায়—মেঘের কোলে রোদ উঠেছে, এইরকম মনে হয়।

সেই সহ-প্রধান শিক্ষক মশাই বললেন, 'আপনারা মূল বিষয় থেকে ক্রমশ সরে যাচ্ছেন। একটা বিচারসভায় আলোচনার এমন শাখা-প্রশাখা বেরনো ঠিক নয়। ছেলেটাকে আপনারা কী করতে চাইছেন সেইটা এবার বলুন। আগের প্রত্যেকটা অপরাধের সাজা সে পেয়ে গেছে। সেইসব নিয়ে আবার কেন টানাটানি।'

হেডমাস্টার মশাই বললেন, 'এই ভূমিকাটুকুর প্রয়োজন ছিল, কারণ এইবার আমরা যে সিদ্ধান্তে আসব সেটা হল, রাস্টিকেট! ওকে রাস্টিকেট করা হল। আশা করি আপনারাও আমার সঙ্গে এক মত হবেন?'

সহ-প্রধান শিক্ষক ছাড়া সকলেই একমত হলেন। সহ-প্রধান বললেন, 'এই পানিশমেন্ট! এতে ছেলেটার একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এটা আমাদের পরাজয়। আমরা তাকে রিফর্ম করতে না পেরে তাড়িয়ে দিচ্ছি। দ্যাটস আওয়ার ডিফিট।'

হেডমাস্টার মশাই একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আপনার মতটা তা হলে

কী ? যে দাঁত তুলে ফেললেই শান্তি, সেই দাঁত আপনার মতো পুষে রাখতে হবে !'

'জেনে রাখুন, দাঁতই আমার পরম শিক্ষক। আমি ধ্বংসের বিরোধী। যে নদীতে বন্যা হয়, সেই নদী কি বুজিয়ে ফেলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়, না নেওয়া যায় ! নদীকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হয়। জীবন হল নদীর মতো। ও আমাদের কাছে এসেছে কেন ? মানুষ হওয়ার জন্যে।'

'অমানুষকে মানুষ করা যায় না।'

'ও এখনও বালক, তবে আপনারা এইবার যা করতে চাইছেন, তাতে অমানুষই হবে। রাস্টিকেট করলে আর কোনও স্কুলে ভর্তি হতে পারবে না। অসৎসঙ্গে পড়ে একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।'

'আর ওর সঙ্গে পড়ে যে আমাদের ভাল ছেলেরা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।'

'শুনুন, শুনুন, বদমাইশি করতে হলে সাহস থাকা চাই, সেই সাহস কটা ছেলের আছে ! গত বিশ-তিরিশ বছরে এমন একটা দুর্দান্ত ছেলে আমরা পেয়েছি কি ?'

সকলেই বসে রইলেন নীরবে, কিছুক্ষণ। লাল হেডমাস্টার মশাই বসে আছেন বিশাল আসনে। আমরা একদল লাল ছেলে আর সাদা ছেলে দাঁড়িয়ে আছি ঘরের বাইরে। ঘরের ভেতরে বুলেটের ভাগ্য পরীক্ষা হচ্ছে।

হেডমাস্টার মশাই বললেন, 'ভোটে কিন্তু আপনি হেরে যাচ্ছেন। রাস্টিকেটের পক্ষে সবাই, বিপক্ষে আপনি একলা। আপনার সহানুভূতির কারণটা তো বোঝা গেল না ?'

'তা হলে শুনুন, আমাদের দারোয়ান রামাধরের নাতি কি আজ বেঁচে থাকত, যদি বুলেট না বাঁচাত ! ভাদ্র মাসের ভরা গঙ্গায় ডুবে মারা যেত। দিস ইজ নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, আমাদের পণ্ডিত মশাইয়ের পেট ফুটো হয়ে যেত যদি বুলেট সেদিন নিজে আহত না হয়ে পণ্ডিত মশাইকে বাঁচাত ! কে পণ্ডিতমশাইকে রোজ একটা করে গাছের লাউ দিয়ে আসে ! শীতকালে শিম আর ফুলকপি। নাম্বার থ্রী, আমাদের গেম-টীচারের মা প্যারালিটিক, তাঁকে মাসে একবার কে ধরে-ধরে নিয়ে যায় হাসপাতালের আউটডোরে ! নাম্বার ফোর, আমাদের স্কুলের ফুটবল টিমের একমাত্র স্কোরার কে ? কার জন্যে আমাদের স্কুল প্রত্যেক বছর ডিস্ট্রিক্ট চ্যাম্পিয়ান হয় ?'

হেডমাস্টার মশাই বললেন, 'যে-ছেলে স্কুলের প্রধানশিক্ষককে বাঁদুরে রঙে চুবিয়ে দেয়, তাকে তা হলে আমরা কোনও শাস্তিই দেব না ?'

'শাস্তি অনেক দেওয়া হয়েছে, শাস্তির বাড়াবাড়ি, আমার মনে হয় ওকে শাস্তির বদলে ভালবাসা দিতে হবে। একমাত্র ভালবাসাই ওকে বড় হতে সাহায্য করবে।'

'আপনি তা হলে ওকে ভালবেসে বড় করুন, তবে এই স্কুলে আর নয়। ওকে যদি এই স্কুলে রাখা হয়, আমি রেজিগনেশান দেব।'

সহ-প্রধানশিক্ষক বললেন, 'ওকে যদি তাড়ানো হয় আমি রেজিগনেশান দেব।'

সভা স্তব্ধ। এ যেন পাঞ্জার লড়াই। কোনওদিকেই কোনও হাত পড়ছে না, সমানে-সমানে আটকে গেছে। এমন সময় রামাধর চা নিয়ে ঢুকল। আমাদের দরোয়ান। খুব ভালমানুষ। যখনই সময় পায় গলা ছেড়ে গান গায়। টিফিনের সময় গেটের পাশে ছোলা সেদ্ধ, কাঁচা লংকা, পেঁয়াজ আর লেবু নিয়ে বসে। চার আনায় এমন এক মিকশ্চার তৈরি করে দেয়, খেলে আর ভোলা যায় না। গরমকালে বিলিতি আমড়া, কামরাঙা, এইসবও বিক্রি করে। রামাধর আমাদের বেস্ট ফ্রেন্ড। বিহারের মানুষ। বিশাল শরীর। একমাথা কাঁচা-পাকা চুল। একটা কথা বললে ভীষণ রেগে যায়, চুটকি মে রাধেশ্যাম। রেগে একেবারে কাঁই হয়ে যায়। আমরা মাঝে-মাঝে বলি। কী করব, কেউ রেগে গেলে ভীষণ ভাল লাগে। তবে কাঁচা শালপাতায় লেবুর রসমাখা ছোলা পেঁয়াজের কথা ভাবলে আর রাগাতে ইচ্ছে করে না। গরমের রাতে স্কুলের মাঠে রামাধর খাটিয়ায় শুয়ে থাকে। বাতাসে গাছের পাতার শব্দ শুনতে-গুনতে, গান গাইতে-গাইতে ঘুমিয়ে পড়ে।

রামাধর সকলের মুখের ওপর কথা বলতে পারে। সব মাস্টার মশাই ওকে ভালবাসেন ওর সরল বুদ্ধির জন্য। চা দিতে দিতে রামাধর শুধু একটা কথাই বলল, 'নিজের ছেলে হলে বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারতেন! যারা ছেলে-বেলায় দুষ্টু থাকে তারা বড় হলে খুব ভাল হয়ে যায়। হোলি আসছে, রং খেলেছে, চান করলেই উঠে যাবে, এ নিয়ে কেউ রাগারাগি করে ? চা খেয়ে সব মাথা ঠাণ্ডা করুন। কালকে আচ্ছা করে পিটিয়ে দেবেন। কত বদমাইশ ছেলে এই স্কুল থেকে মানুষ হয়ে গেল।'

রামাধর বকবক করছে আর সকলকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিচ্ছে। কেটলিটা

হাতে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, 'নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করাটা ঠিক নয়।'

রামাধর চলে গেল। সকলের চা খাওয়া শেষ হল। অনেকে পকেট থেকে মসলার কৌটো বের করে মুখে ফেললেন। হেডমাস্টার মশাই হঠাৎ বললেন, 'বেশ, ব্যাপারটা তা হলে মিটমাট করে নেওয়া যাক।'

সবাই একসঙ্গে বললেন, 'অবশ্যই, অবশ্যই। তা হলে আজ আমরা উঠি।'

হেডমাস্টার মশাই বললেন, 'এ আবার কী কথা! আমাদের আসল কথাটা কী ছিল! ছেলেটার কী সাজা হবে!'

অঙ্কের মাস্টারমশাই বললেন, 'কোনও ব্যাপার নয়, কাল গাধার টুপি মাথায় দিয়ে সব ক্লাসে ঘোরানো হবে।'

হেডমাস্টার মশাই বললেন, 'না, ওটা পুরনো হয়ে গেছে। ওকে আমরা সংবর্ধনা জানাব। গলায় ফুলের মালা পরিয়ে আমরা বক্তৃতা করব, এই মহাপুরুষ পৃথিবীতে খুব কমই জন্মায়। এর গুণের শেষ নেই। অর্থাৎ আমরা…।'

কথা শেষ হওয়ার আগেই ব্যাকরণের শিক্ষক মশাই বললেন,'অর্থাৎ ব্যাজস্তুতি, যেমন, রঘুবংশ-অবতংস, যা করেছ যোগ্য সে তোমার / মিত্ররক্ষা সাধুব্রত যুগে যুগে রয়েছে প্রচার / বিনা অপরাধে মোরে মিত্রহিতে করিলে সংহার / ভগবান, এর চেয়ে মহনীয় কি বা আছে আর!'

আমাদের ব্যাকরণের স্যার এইরকমই। এত জানেন যে সবেতেই ব্যাকরণ বেরিয়ে আসে। এ এক মহা সমস্যা! একটা কিছু বললেই হল, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণ নিয়ে ভাঙতে বসবেন।

হেডমাস্টার মশাই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। উঠে দাঁড়িয়েই কাঁপতে-কাঁপতে বসে পড়লেন চেয়ারে। মাথাটা এক পাশে হেলে গেল। সবাই কী হল, কী হল, বলে চারপাশ থেকে এগিয়ে গেলেন। সব শেষ! স্কুল কেন, পৃথিবী ছেড়েই চলে গেলেন, আমাদের প্রিয় প্রধানশিক্ষক মহাশয়।

॥ ২ ॥

নিস্তব্ধ স্কুল বাড়ি। আমরা, সব ছেলে মাঠে দাঁড়িয়ে আছি। নিঃশব্দে, নীরবে সবাই আসছেন। বিষণ্ণ মুখে কেউ ফিরে যাচ্ছেন, কেউ দাঁড়িয়ে পড়ছেন। ফুল আসছে কত! কিছুক্ষণের মধ্যে হেডমাস্টার মশাই হয়ে গেলেন ফুল। শুধু

ফুল আর ফুল। সবাই বলতে লাগলেন, এই মৃত্যুর জন্য দায়ী সহ-প্রধান শিক্ষক। আবার কেউ-কেউ বললেন, দায়ী বুলেট। মানী পণ্ডিত মানুষ এই হেনস্তাটা ঠিক সহ্য করতে পারলেন না, ধাক্কাটা সোজা হার্টে গিয়ে লাগল।

সহ-প্রধান শিক্ষক এক পাশে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে আছেন। হেডমাস্টার মশাইয়ের মাথার কাছে হাটু গেড়ে বসে আছে রুপেন। যে একটা পাখি মরে গেলে খাওয়া বন্ধ করে দেয়। তার চোখের সামনে একজন মানুষ মারা গেছেন, তার মনের অবস্থা কী আমরা সহজেই বুঝতে পারছি। আমার বুকের কাছটাও মাঝে-মাঝে গুড়গুড় করে উঠছে আর চোখ ফেটে বেরিয়ে আসছে জল। হঠাৎ কোথা থেকে বুলেট এল ছুটতে-ছুটতে। হেডমাস্টার মশাইয়ের মাথার কাছে দাঁড়াল। চোখ দুটো বড় বড়। এক মাথা কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল। পাথর-কোঁদা চেহারা। হেডমাস্টার মশাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখের পলক পড়ছে না।

আমরা কিছু বোঝার আগেই সহ-প্রধান শিক্ষক বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন বুলেটের ওপর, 'বদমাশ, তোকে আজ আমি মেরেই শেষ করব।' সহ-প্রধান শিক্ষক এমনই একটু দুর্বল মানুষ, কিন্তু সেই সময় কী জোর। চুলের মুঠি ধরে বুলেটকে মাটিতে পেড়ে ফেললেন। নিস্তব্ধ, গম্ভীর পরিবেশ মুহূর্তে ভয়ংকর হয়ে উঠল। বুলেটের গলা টিপে ধরেছেন। সে কোনও বাধাই দিচ্ছে না। অন্য কোনও সময় হলে বুলেট আঁচড়ে-কামড়ে শেষ করে দিত। বুলেটের জিভ বেরিয়ে এসেছে, চোখ কপালে উঠে গেছে। হয়তো মরেই যেত, যদি না রামাধর ছুটে এসে সহ-প্রধান শিক্ষককে সরিয়ে নিত। বুলেটের মুখ দিয়ে গাঁজলা বেরিয়ে এসেছে। মড়ার মতো পড়ে আছে চিৎপাত হয়ে। কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না। অসভ্য, বাঁদর ছেলে। দু'চক্ষে ছেলেটাকে কেউ দেখতে পারে না। শরীরে বন্য বরাহের মতো জোর। কিরাতের মতো চেহারা। গুলতি দিয়ে পায়রা মেরে আগুনে ঝলসে খায়। আমরা কেউই ওর সঙ্গে গায়ের জোরে পেরে উঠি না।

এমন সময় হেডমাস্টার মশাইয়ের ছোট ভাই সাদা একটা মোটর চেপে এসে গেলেন। খুব বড়লোক, ব্যবসা করেন। দু'ভাইয়ের কেউই বিয়েটিয়ে করেন নি। বিশাল-বিশাল থামঅলা বিরাট একটা বাড়িতে থাকেন। সেই বাড়িতে সুন্দর সবুজ একটা মাঠ আছে। ফুলের বাগান। সিঁড়ির বাঁকে দাঁড় করানো আছে আলমারির মতো প্রকাণ্ড একটা ঘড়ি। ঝকঝকে পেণ্ডুলামটা

খুব ধীরে-ধীরে দোল খায়। যখন বাজে, মনে হয় চার্চের ঘণ্টা বাজছে। বাড়ির বাগানে সুন্দর একটা পুকুর আছে। ছ'টা রাজহাঁস আছে, সাদা ধবধবে। আরও কত কী যে আছে! সব তো আমরা দেখি নি। বিছরে আমরা একবারই যেতে পাই, জগদ্ধাত্রী পুজোর সময়। কত বড় একটা লাইব্রেরি আছে বাড়িতে। হেডমাস্টার মশাইয়ের জন্য আমার ভীষণ মন খারাপ হচ্ছে। এইসব ভাল-ভাল জিনিস তিনি আর দেখতে পাবেন না। সবুজ মাঠ, নীল পুকুর, সাদা কাঁচ লাগানো টেবিল ল্যাম্প জেবলে মোটা-মোটা বিলিতি বই পড়া। সব শেষ হয়ে গেল। মাস্টারমশাই আর কোনওদিনও ফিরে আসবেন না। এই যে যাচ্ছেন তো যাচ্ছেনই। চির বিদায়। ফুলে-ফুলে ঢাকা খাট ছোট্ট একটি লরিতে উঠল। খুব চাপা গলায় সবাই কয়েকবার বললেন, 'বল হরি!' বুলেট পড়ে রইল। আমরা পেছন-পেছন চলেছি সার বেঁধে, সামনে-সামনে চলেছেন শিক্ষক মশাইরা। মরে যাওয়ার মধ্যে বেশ একটা মজা আছে। বেশ বড়মানুষ হয়ে পট করে মরে যাও। তারপর দ্যাখো না কী হয়! কত সম্মান, কত ভালবাসা!

প্রথমে হেডমস্টার মশাই গেলেন বাড়িতে। সবুজ লনে খাটটা রাখা হল গাড়ি থেকে নামিয়ে। সামনেই বিশাল বড় থাম. ঝুলবারান্দা। ফুলে-ফুলে ভরা লতানে গাছ। মাস্টারমশাই কিছুই দেখছেন না। নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। চোখ আছে, দৃষ্টি নেই। আর তখনই বাড়ির ভেতরে সেই ঘড়িটা বেজে উঠল গম্ভীর সুরে। বাড়ির ভেতর থেকে ছুটে এল মাস্টার-মশাইয়ের কুকুর। বাঘের মতো বিশাল এক অ্যালসেশিয়ান। খাটের চারপাশ বারকতক ঘুরে পায়ের কাছে বসে পড়ল। ছবির মতো স্থির। চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। রুপেন আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। ফিসফিস করে বলল, 'দেখবি, সাত দিনের মধ্যে কুকুরটা না খেয়ে মারা যাবে। কুকুরের মতো জীব হয় না।' বাড়ির সব লোকজন একে-একে বেরিয়ে এলেন। কোথাও কোনও কান্নাকাটি নেই। বরফের মতো জমাট শোক।

আমরা যখন শ্মশানে পেঁছিলুম, তখন রাত হয়ে গেছে। দেখি বটতলার অন্ধকারে বুলেট বসে আছে। মার খেয়ে মুখচোখ ফুলে গেছে। ঠোঁট কেটে রক্ত বেরিয়ে শুকিয়ে জমে গেছে। ওর চেহারা দেখে ভীষণ মায়া হল। কাছে গিয়ে বললুম, 'কী রে বুলেট! তোর তো ডাক্তারখানায় যাওয়া উচিত। এখানে বসে আছিস?'

বুলেট হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল। একটাও কথা বলতে পারল না।

হাঁটুতে মাথা রেখে ফুলে-ফুলে কাঁদছে। বুলেটের মা নেই। পাঁচ-'ছ বছর আগে মারা গেছেন। বুলেটের বাবার চিনেবাজারে বড় দোকান আছে। পয়সার অভাব নেই, তবে সংসারটা খুব এলোমেলো। বুলেট নিজে-নিজেই বড় হচ্ছে, নিজের মতো করে। বুলেটের বাবা ভয়ানক বদরাগী। বেজায় অহংকারী। স্কুলের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আসেন গাড়ি চেপে। সামনের সারির চেয়ারে বসে দামী সিগারেট খান ভুসভুস করে। স্কুলে যে সিগারেট খেতে নেই, এই বুদ্ধিটাই নেই। বুলেটের মায়ের নামে প্রত্যেক বছর একটা সোনার মেডেল দেন। ফার্স্ট ক্লাসের ফার্স্ট বয় সেই মেডেল পায়। রমলা স্মৃতি পদক। পয়সা আছে বলে সবাই খুব খাতির করে। একবার ইলেকশানে দাঁড়িয়েছিলেন। জিততে পারেন নি।

শ্মশানের কিছুটা দূরেই আমাদের ডাক্তারবাবুর চেম্বার। গেলুম সেখানে। ডাক্তারবাবু আমাকে খুব ভালবাসেন। ভালবাসার কারণ, ডাক্তারবাবুর মাছ ধরার নেশা। আমি তাঁকে ভালভাল বাগানবাড়ির সন্ধান এনে দিই, যেখানে পুকুর আছে। পাঁউরুটি, আর পিঁপড়ের ডিম দিয়ে টোপ মেখে দিই। মাঝে-মাঝে হুইল ছিপ বয়ে নিয়ে যাই। এসবই হয় বেশ রোদ-ঝলমলে ছুটির দিনে। ডাক্তারবাবু তখন আমার বন্ধুর মতো। কখনও-কখনও আমাদের মধ্যে দৌড় কম্পিটিশান হয়। ডাক্তারবাবু আমাকে বলেন, 'ছেলেমানুষ হয়ে যাওয়ার কী আনন্দ! সেটা বোঝা যায় মানুষ যখন বড় হয়ে যায়।'

চেম্বার তখন ভর্তি। হাঁচি, কাশি, জ্বর, বাত সব লাইন মেরে বসে আছে। তবু ডাক্তারবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী সমস্যা জগঝম্প!' ডাক্তার-বাবু আমার আদরের নাম রেখেছেন, 'জগঝম্প'। এরও একটা কারণ আছে। ডাক্তারবাবু নাটাগড় বলে একটা জায়গায় আমরা মাছ ধরতে গিয়েছিলুম, সেখানে একটাকালো রঙের সাপ দেখে অ্যায়সা লম্ফঝম্প করেছিলুম, সেই থেকেই ডাক্তারবাবু নাম রাখলেন জগঝম্প।

ডাক্তারবাবুকে সব কথা খুলে বললুম। ছেলেটা শ্মশানের বটতলায় বসে আছে। এখানে তাকে আনা যাবে না কিছুতেই। তবে একেবারে ক্ষতবিক্ষত। 'ডাক্তারবাবু, একটা কিছু তো করতে হয়।'

সব ছেড়ে ডাক্তারবাবু আমাকে এক শিশি অ্যান্টিসেপটিক আর অনেকটা তুলো দিয়ে বললেন, 'কেটে যাওয়া জায়গা ভাল করে ওয়াশ করে, এই মলমটা লাগিয়ে দাও ভাল করে। সব সেরে যাবে।'

শ্মশানে ফিরে এসে দেখি বুলেট বটতলায় শুয়ে পড়েছে। বেহুঁশ জ্বর। গা পুড়ে যাচ্ছে। পাতার ফাঁক দিয়ে ল্যাম্পপোস্টের এক চিলতে আলো মুখে পড়েছে। মুখটা দেখলেই মায়া হয়। তুলো ভিজিয়ে ঠোঁটের কাটায় লাগাতেই চোখ মেলে তাকাল। জ্বরের ঘোরে ভুল বকছে, 'সার! আমাকে আর মারবেন না। আমি এমনই মরে যাব। দেখবেন ঠিক মরে যাব।'

বুলেট চিনেছে। ঘোর খানিকটা কেটেছে। শুয়ে ছিল, উঠে পড়েছে।

'তুই আমাকে ভালবাসিস পলাশ!'

'ভাল না বাসলে ডাক্তারখানায় গিয়ে তোর জন্যে ওষুধ নিয়ে আসি!'

বুলেট আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। ওদিকে কিছুটা দূরে চিতা জ্বলে উঠেছে দাউদাউ করে। অন্ধকারে নাচছে আলোর শিখা।

বুলেট বলল, 'জানিস পলাশ, আমি খুব খারাপ ছেলে। আমি একটা মানুষকে খুন করলুম। আমার জন্যেই হেডসার চলে গেলেন। আমি বাবার সিগারেটের প্যাকেট থেকে চুরি করে খাই। আমার পড়ায় মন বসে না, আমি মিথ্যে কথা বলি। তবুও তুই আমাকে ভালবাসিস পলাশ। তোকে একদিন খেলার মাঠে ভীষণ মেরেছিলুম, মনে আছে তোর?'

'সব মনে আছে।'

'তা হলে কেন আমাকে ভালবাসিস!'

'তুই যখন কোথাও চুপ করে বসে থাকিস নিজের মনে, আমি দূর থেকে তোর মুখ দেখেছি। মনে হয়েছে আমাদের সকলের মা আছে. তোর মা নেই। আবার মনে হয়েছে, আজ তুই এইরকম আছিস, একদিন তুই বড় হবি। হবিই হবি। আমাদের সকলের চেয়েও বড়।'

বুলেটের ঠোঁটে, গালে মলম লাগাচ্ছি। কনুইতে, হাঁটুতে। জ্বর, গরম নিশ্বাস পড়ছে আমার হাতে।

বুলেট বলল, 'সত্যিই আমি বড় হব!'

'দেখবি, আমি যা বলছি ঠিক হয় কি না। তুই আর কুড়িটা বছর অপেক্ষা করে দ্যাখ। আমার কথা ঠিক হবেই হবে।'

'আমি আর এই স্কুলে পড়ব না পলাশ, ট্রান্সফার নিয়ে চলে যাব কোথাও।'

'তা হবে না। এই স্কুলেই তোকে পড়তে হবে, এইখানেই তোকে প্রমাণ করতে হবে, আমি পারি।'

বুলেট হাঁটুতে মাথা রেখে বসে রইল। ওদিকে রাত শেষ হয়ে আসছে। পূব আকাশে গোলাপি রং অন্ধকারকে তাড়া করেছে। সব অন্ধকার পশ্চিম আকাশ দিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে।

চিতায় জল ঢালা হচ্ছে। আগুনের ছ্যাঁক-ছ্যাঁক শব্দ। ধোঁয়া আর ছাই। ছাই থেকে হাতড়ে-হাতড়ে মাস্টারমশাইয়ের দেহাবশেষ বের করে মাটির পাত্রে তুলে সবাই গঙ্গার ঘাটের দিকে এগোলেন। ভোরের আলোয় গঙ্গার জল টকটক করছে। গঙ্গার মাটি তুলে তাল করে তার মধ্যে রেখে ছুঁড়ে দেওয়া হল গঙ্গার জলে। একটা নৌকো চলছে ছপাত-ছপাত দাঁড়ের শব্দ তুলে।

বুলেট নেভা চিতার দিকে তাকিয়ে আছে ফ্যালফ্যাল করে।

॥ ৩ ॥

আমাদের পণ্ডিত মশাই বলতেন খারাপ যখন ভাল হয় তখন সে সাংঘাতিক ভাল হয়ে যায়। খারাপও নয় ভালও নয়, এইরকম মাঝামাঝি ছেলেদের নিয়েই সমস্যা বেশি। গোরুর গাড়ির মতো টিকিয়ে-টিকিয়ে তারা জীবনের পথ ধরে চলে। তোমরা রত্নাকরের কথাটাই একবার ভাবো। ছিলেন দস্যু, হয়ে গেলেন মহাকবি। এমন এক মহাকাব্য লিখলেন, যা আজও অমর।

বুলেট এক ধাক্কায় বদলে গেল। একেবারে অন্য ছেলে। ক্লাসে আসে, এক পাশে বসে। কারও সঙ্গে মেশে না, কথা বলে না, গম্ভীর। চোখ-মুখের চেহারাই অন্যরকম হয়ে গেছে। আমাদের ফার্স্ট বয় মহা হিংসুটে, অহংকারী। এমন একটা ভাব করে, যেন নোবেল পুরস্কারটা পেয়েই গেছে। ওর বাবাও খুব অহংকারী। বড় চাকরি করেন স্লিপিং স্যুট পরে ঘুমোতে যান। সব সময় ঠোঁটে একটা পাইপ। ধোঁয়া বেরোতে দেখিনি কোনওদিন। শুধু কায়দা করে চিবোন। যখন কারও সঙ্গে কথা বলেন তখন পাইপটা খঞ্জন পাখির লেজের মতো নাচে। সেই ফার্স্ট বয় তার বন্ধুদের বলেছে, জানোয়ার কখনও মানুষ হয়!

কথাটা বুলেটের কানে গিয়েছিল। আমাকে একদিন ফিসফিস করে বলল, 'দেখবি, ওর দাঁত এক দিন আমি ভাঙব।'

'আবার মারামারি করবি?'

'এ মার অন্য মার। হাতে মারব না আঁতে মারব।' কথাটা তেমন বিশ্বাস করতে পারি নি। কী করে তা সম্ভব! শেষ কখনও সামনে আসতে পারে।

একেবারে সামনে! আমাকে আমার মাস্টার মশাই বললেন, 'মন, মনই সব। একজন যখন এভারেস্টের চূড়ায় ওঠে, তখন আগে তার মন ওঠে। দেহ তো মনের ভৃত্য!'

এক রবিবার দুপুরবেলায় বুলেটের বাড়ি গেলুম দেখতে, বুলেট কী করছে! বুলেটের বোন বলল, 'সে তো গুহায়!'

'গুহা মানে? গুহায় তো সাধু-সন্ন্যাসীরা থাকেন!'

'একতলায় একটা ঘর আছে। সেই ঘরে কোনও জানালা নেই। ছোট্টমতো একটা দরজা দিয়ে ঢুকতে হয়। দাদা ওই ঘরটাতেই সব সময় থাকে।'

'আমি যাব রে!'

'যাও না, সোজা চলে যাও। একেবারে পেছনে, বাগানের দিকে, যেখানে আমাদের আইসক্রীম কল ছিল।'

বুলেটদের একটা আইসক্রীম ফ্যাক্টরি ছিল। বুলেটের জ্যাঠামশাইয়ের। খুব চালু ছিল। আমরা যখন আরও ছোট ছিলুম, রোজ খেতুম; আইসক্রীমের নাম ছিল, জলি। জ্যাঠামশাই মারা যাওয়ার পর কী হল, কলটা বন্ধ হয়ে গেল।

বুলেটদের বাড়িটা খুব বড়। অনেক লোকজন। খুব ঘ্যাঁচোর-ম্যাচোর। সেইসব পেরিয়ে বাগানের দিকে গেলুম। আইসক্রীম কলের টিনের শেডটা এখনও আছে। সেই বিরাট চৌবাচ্চাটা, যেখানে জল থাকত। টিনের শেডে আর একটা কারখানা হয়েছে। আয়ুর্বেদিক ওষুধের। এটা বুলেটের বাবার। বড়-বড় লোহার কড়ায় গাছ-পাতা ফুটছে। অদ্ভুত তার গন্ধ। শিশি, বোতল, কৌটো, বড়-বড় হামানদিস্তে। একদল মেয়ে-পুরুষ ভীষণ ব্যস্ত।

একজন বললেন, 'ছোটবাবুকে খুঁজছ। সে আছে ঠাণ্ডি ঘরে।'

ঠাণ্ডি ঘর মানে সেই গুহা, যার ভেতর তৈরি আইসক্রীম থাকত সাইবেরিয়ার মতো ভয়ংকর ঠাণ্ডায়। সেই সময় আমি একবার দেখেছিলুম। গোল মতো একটা দরজা। ভেতরটা নীল কুয়াশায় ভরা। দরজাটা খোলা মাত্রই হিমের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এল দুধ-দুধ ভ্যানিলার গন্ধ। সেই ঘরে বুলেট! দম আটকে মরে যাবে যে!

ছোটদের বিলিতি ছবির বইয়ে যে রকম ঘর দেখা যায়, যে-ঘরে খরগোশ, কি মিকি মাউস কি পশুরাজ থাকে, বুলেটের গুহাঘরের দরজাটা ঠিক সেইরকম। সদ্য রং করা হয়েছে। রঙের গন্ধ বেরোচ্ছে। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। বেশ

কয়েকবার টোকা মারার পর দরজাটা খুলল। সামনে দাঁড়িয়ে বুলেট বলল, 'আয় ভেতরে, আয়।'

ঘরটা খুব একটা ছোট নয়। ছাদটা ইংরেজি 'ডি' অক্ষরের মতো। মেঝেটা কালো কুচকুচে। মেঝেতে একটা মাদুর। তার ওপর একটা ডেস্ক। চারপাশে বই-খাতা ছড়ানো। স্বামী বিবেকানন্দের একটা বড় ছবি মেঝেতে দাঁড় করানো। সেইদিকে তাকাতেই বুলেট বলল, 'আমার গুরুদেব!'

'এই ঘরে তোর দম আটকে যাচ্ছে না!'

'দম আটকাবার জন্যেই তো এই ঘরটা বেছে নিয়েছি। বড়-বড় জানালা থাকলে মন বাইরে ছিটকে পালায়। এই ঘরে মনটা বেশ আটকে থাকে। পড়াটা বেশ জমে যায়। জানিস তো, স্বামীজি একসঙ্গে এক পাতা পড়ে ফেলতেন। ঘটনাটা ঘটেছিল মিরাটে। লাইব্রেরি থেকে বই আনিয়ে পড়তেন। এক-একটা মোটা বই এক-একদিনে শেষ। লাইব্রেরিয়ানের সন্দেহ হল। একদিন বলেই ফেললেন, 'স্বামীজি, আপনি পড়েন না পড়ার ভান করেন?' স্বামীজি বললেন 'তাই নাকি! আচ্ছা আপনি প্রশ্ন করুন। আপনার যা ইচ্ছে, বইটার যে-কোনও জায়গা থেকে প্রশ্ন করুন।' লাইব্রেরিয়ান একের পর এক প্রশ্ন করছেন, স্বামীজি ঝট-ঝট উত্তর দিচ্ছেন। বইয়ের এক-একটা অংশ গড়গড় করে বলে যাচ্ছেন। লাইব্রেরিয়ান ভদ্রলোক অবাক! এ কেমন করে সম্ভব। স্বামীজি বলেছিলেন, 'ব্যাপারটা খুবই সোজা। শিশু যখন সবে পড়তে শেখে, সে এক-একটা অক্ষর ধরে পড়ে, যেমন আ আর ম। আম। সে যখন লেখাপড়ায় আর-একটু এগোয়, তখন একবারেই পড়ে—আম। সেইরকম চেষ্টা করলে একসঙ্গে একটা লাইন পড়া যায়। আমি এক নজরে একটা পাতা পড়ে ফেলি। আসল রহস্য হল একাগ্রতা। আমার এই ঘরে বসলে একাগ্রতা বাড়ে। কোনও দিকে মন যাওয়ার উপায় নেই। সকালে উঠেই আমি আমায় দিনটাকে স্বামীজির পায়ে অঞ্জলি দিয়ে দিই। নিন, যা যা করার করুন। পলাশ, লেখাপড়ায় আমি খুব পিছিয়ে আছি। আমাকে দৌড়তে হবে, আমাকে দেখাতে হবে, আমি পারি। কেউ বিশ্বাস করছে না। স্কুলে আমি ইচ্ছে করে ভুল পড়া দিই। সবাই যাতে ভাবে, গাধাটা আছে। আমি দেখাব পরীক্ষার খাতায়।'

'তুই সত্যিই পারবি! পারা যায়!'

'স্বামীজি বলেছেন, মানুষের অসাধ্য কাজ কিছুই নেই।'

'তোর হচ্ছেটা কেমন? হাফ-ইয়ারলিতে অঙ্কে মাত্র পনেরো!'

'তুই যে-কোনও একটা শক্ত অংক আমাকে দে। পরীক্ষা কর!'

তিন দিন ধরে আমার একটা অংক নিয়ে আমি হিমশিম খাচ্ছিলুম। কিছুতেই কিছু করতে পারছিলুম না। সেই অংকটাই বুলেটকে দিলুম। খাতায় অংকটা লিখে মিনিট পাঁচেক সেইদিকে তাকিয়ে রইল চুপ করে। যেন ধ্যান করছে! তারপর হঠাৎ নড়ে চড়ে উঠল। তখন আমাকে আর দেখছে না। আমি যে ঘরে আছি, সেই কথাটাই যেন ভুলে গেছে। পেন্‌সিল দিয়ে খসখস করে তিন-চার লাইন কী কষে গেল। শেষে খাতাটা আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'এই নে, তোর উত্তর।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম। সত্যিই, উত্তর মিলে গেছে।

'কী করে করলি? আমি তিন দিন ধরে চেষ্টা করছি নানাভাবে। আমি কেন পারলুম না!'

'তার কারণ, তুই ধ্যান করিস নি। একটা ঘর, তার তিরিশটা দরজা। যে-কোনও একটা খোলা আছে। বাকি সব বন্ধ। সেই দরজাটা তোকে চিনতে হবে মন দিয়ে। এর জন্যে ধ্যান চাই। সোজা এগিয়ে গেলি। যেই ঠেললি, দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকলি। দেখলি, যা চাইছিস, কোণের টেবিলের ওপর রাখা আছে। সোজা এগিয়ে গিয়ে তুলে নে। দেখিসনি, অনেকে এইভাবে পথের নির্দেশ দেয়, সোজা পুব দিক। প্রথম বাঁ হাতি গলি। একটা মুদির দোকান। তারপরেই বাঁ দিকে একটা গলি। এঁকেবেঁকে চলেছে, চলেছে। একটা শীতলা মন্দিরের গায়ের বাড়িটা, তেষট্টির দুই। অংকও ঠিক সেই রকম!'

'তোকে এইসব কে শেখালেন?'

'স্বামীজি।'

'তিনি তো নেই!'

'কে বলেছে! ডাকলেই তিনি আসেন। এই ঘরে এখন রবীন্দ্রসঙ্গীত হচ্ছে, তুই শুনতে পাচ্ছিস!'

'কোথায় রবীন্দ্রসঙ্গীত? তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

বুলেট বসে-বসেই ঘরের আর-একদিকে এগিয়ে গেল। একটা রেডিও। যেই নব ঘোরাল, রবীন্দ্রসঙ্গীত। দেবব্রত বিশ্বাসের গলা, আকাশভরা সূর্য তারা।

'তুই এইভাবে বলছিস?'

বুলেট বলল, 'তা আর কী ভাবে বলব! ঠিকমতো নিজেকে টিউনিং করতে

পারলেই সব ধরা যায়। আসল কথা হল ধ্যান। ধ্যান লাগাতে হয়। প্রথমে আমি স্বামীজির চোখ দুটো দেখি। তারপর মুখ। তারপর সারা শরীর। চোখ বুজিয়ে নাকের ওপর ভুরুর মাঝখানে। তারপর আমার আর কিছু মনে থাকে না।'

"তোকে কে এসব শেখালেন?"

কেউ না, আমি নিজে বই পড়ে, প্রার্থনা করে শিখেছি।'

মেঝেতে মোটা একটা কম্বল পাতা। বসে লেখাপড়া করার একটা ডেস্ক। বই, খাতা, সব ছড়ানো। কোণে একটা জলের কুঁজো। ইকমিক কুকার একটা। কুকার কেন?

'তুই কি নিজের রান্না নিজেই করিস!'

'তা না হলে তো খেতেই পাব না। আমাদের তো হইহট্টগোলে বাড়ি। কোনও কিছুরই ঠিক নেই। স্বামীজি বলেছেন, সুস্থ শরীরেই সুস্থ মন থাকে। শরীর আগে, তারপর সাধনা।'

বুলেটের পরিবর্তন দেখে অবাক। ঘরের একদিকে দুটো দুটো চারটে ইট। ক্লান্ত হয়ে পড়লেই বুলেট শুন বৈঠক মেরে নেয়। চেহারা অনেক উজ্জ্বল হয়েছে। বুলেট একটা কাণ্ড করেছে বটে। আমার হিংসে হচ্ছে। আমি কোনওদিন বুলেট হতে পারব না। আমার সে মনের জোর নেই। সকালে পড়তে বসলেই আমার খেলার মাঠের কথা মনে পড়ে। বল নিয়ে গোলপোস্টের দিকে ছুটছি। কেউ আমার পা থেকে বল কেড়ে নিতে পারছে না। গোলের পর গোল করে যাচ্ছি। পড়তে বসলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে পুকুর। ফড়িং উড়ছে। জলে গাছের ছায়া। বক উড়ে যাচ্ছে। ডাক্তারবাবুর পাশে বসে আছি জলের দিকে তাকিয়ে। ফাতনাটা স্থির হয়ে আছে। ফাতনার মতো স্থির হতে পারলে আমি পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে পারতুম। রাতে পড়তে বসার কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখ ভারী হয়ে আসে পাথরের মতো, ঘুমে। আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

গঙ্গার ধারে বসে বুলেটকে বললুম, 'তোর মতো আমিও করব?'

বুলেট বলল, "ধুর! তুই করবি কেন? তোর বাড়িতে কোনও অশান্তি নেই। আমাদের বাড়ির এক একটা লোক এক-একরকম। কেউ দামাল, কেউ বাচাল। কেউ মামলাবাজ।'

'তোর বাড়ির লোকরা এমন কেন ?'

'ওই যে, টাকা। সব টাকার কুমির। টাকা ছাড়া কিছু বোঝে না। থাকগে যে যেমন, সে তেমন। আমার কাঁচকলা।'

বুলেটকেই আমার গুরু করব কি না ভাবছি। এই তো সেই ছেলে! এর কাছে কোথায় লাগে আমাদের ফার্স্ট বয়! আদুরে গোপাল। ননী খাওয়া চেহারা। সবসময় অহংকারে মটমট করছে। স্বার্থপর, কুচুটে। সবেতেই বাঁকা হাসি। বিরাট বড় হবে। আই. এ. এস। তাই এখন থেকেই এমন ভাব। স্কুলের সরস্বতী পুজোয় কোনওবার আসে না। ওসব পুজোটুজো আমাদের মতো মাঝারি ছেলেদের কাজ। ও তো নিজেই বাবা-সরস্বতী হয়ে বসে আছে। বুলেট যদি কোনওমতে ওকে কাত করতে পারে, আমি আলুর দমের ফিস্টি লাগাব। ন্যাড়াদের ছাদে। ন্যাড়ার বোন পিয়ালিকে বলব রাঁধতে। বয়েসে আমার চেয়ে দু' বছরের ছোট হলে হবে কী, দারুণ রান্নার হাত। আলুকাবলি, কচি আমের ঝাল আচার, শুকনো আলুর দম যা তৈরি করে, একদিন খেলে সাতদিন স্বাদ থাকে মুখে। পিয়ালির মতো মেয়ে হয় না।

আমি বোধ হয় খুব একটা বাজে কাজ করে ফেলেছি, পিয়ালিকে একটা চিঠি লিখেছি, 'পিয়ালি তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে। তুমি ভীষণ ভাল। সবসময় কেমন হেসে কথা বলো! তোমার সঙ্গে আমার রোজ দেখা করতে ইচ্ছে করে। বিকেলবেলা তুমি আমাদের বাড়িতে আসো না কেন? আমাকে কি তোমার ভাল লাগে না! রোজ তুমি রুনুদের বাড়িতে যাও। একদিনও আমাদের বাড়িতে আসো না! আমার দুঃখ হয়, মন খারাপ হয়!'

চিঠিটা ওর হাতে গুঁজে দিয়ে আমি পালিয়ে এসেছি। জানি না কী হবে! চিঠিটার উত্তর না পেলে আমি কোনওদিনই ওদের বাড়িতে যেতে পারব না। এক মাস তো হয়ে গেল। পিয়ালি তো একটা উত্তর দিতে পারত! দূর থেকে ওকে আমি রোজই দেখি। কখনও কমলালেবু রঙের, কখনও নীল রঙের ফ্রক পরে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, কি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে নিজের মনে চুল এলো করে। আমার খুব ইচ্ছে করে কাছে যেতে। কত কথা আছে, ওকে বলার মতো কত গল্প। রাতে যখন পড়তে বসি তখন কেবলই ওর কথা মনে পড়ে। কী করছে পিয়ালি। আমার বইয়ে একটা ছবি আছে। নদী, পালতোলা নৌকো, একটা ছেলে আর একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি, নদীর ধারে। মনে করি, আমি আর পিয়ালি দাঁড়িয়ে আছি। সত্যি, সত্যি এমন কেন হয় না!

হঠাৎ ঠিক হল, সন্ধেবেলা আমি বামনদাসবাবুর বাড়িতে পড়তে যাব, সপ্তাহে তিন দিন। ইংরেজি আর অঙ্ক। তিনি ভীষণ ভাল পড়ান। তাঁর ছাত্রছাত্রীরা সব ফার্স্ট ডিভিশানে, লেটার নিয়ে পাশ করে। জার্মানি, আমেরিকা, ইংল্যান্ডে চলে যায় বড়-বড় চাকরি নিয়ে।

সেই বুধবার, যে-বুধবারে আমি প্রথম পড়তে গেলুম, আমার জীবনের কখনও না-ভোলার দিন। বাড়িটা তো বিশালই! দুর্গাদালান, উঠোন, এইসব পেরিয়ে ঢুকতে হয়। মা-দুর্গা মানেই পায়রা। অসংখ্য পায়রা দুর্গাদালানে ঘুঁড়ড়-ঘুঁড়ড় করছে। সে এক অদ্ভুত ধরনের ডাক। যেন ঝুমঝুমি বাজাচ্ছে। মেঝেটা পায়রাদের নোংরা ময়লায় চাপা পড়ে গেছে। সেই আবার পুজোর সময় পরিষ্কার হবে। মায়ের কাঠামোটা এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এই একই কাঠামোয় বছর-বছর প্রতিমা তৈরি হয়। ভাল দিন দেখে কাঠামো-পুজো হয়, তারপর খড় জড়ানো হয়, তারপর মাটি চাপে। একটু-একটু করে তৈরি হয় মায়ের সুন্দর মূর্তি। মুখে ঘামতেল। এই বড়-বড় চোখ। যে-চোখের দিকে তাকালেই আমার ভেতরটা কেমন হয়ে যায়। আর পিয়ালির কথা মনে পড়ে যায়। গত বছর সপ্তমীর সন্ধেবেলা আমি আর পিয়ালি লুকিয়ে-লুকিয়ে 'পাঁচমাথা' পুজোর মেলায় গিয়েছিলুম। কেউ জানে না। পিয়ালিই আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। আমার ভয় করছিল খুব। বাড়ির কেউ জানতে পারলে ধোলাই হত। রামধোলাই। পিয়ালির কাছে সেদিন অনেক টাকা ছিল। কুড়ি, তিরিশ, চল্লিশ, আরও কত, কে জানে! রুমালে বেঁধে জামার তলায় রেখেছিল। কী না করেছিলুম আমরা সেদিন! ভয়ও করছিল। যদি বাড়িতে খবরটা চলে যায়, ওগো দেখে এলুম গো! আমাদের পাড়ায় এইরকম একদল লোক আছে, ব্যাটাছেলে, মেয়েছেলে, দুই-ই। তারা শুধু খবর রেখে বেড়ায়, কে কী করছে! এদের সবাই বলে, রয়টার।

প্রথমে আমরা শালপাতায় ঘুগনি খেয়েছিলুম লেবুর রস দেওয়া। তারপর একরাউন্ড ঘোরাঘুরির পর, গরম আলুর চপ, ডালবড়া। তারপর পিয়ালির চুড়ি কেনা, গলার মালা। সব পরেটরে বলেছিল, 'বল তো কেমন দেখাচ্ছে?' সত্যিই কী ভাল দেখাচ্ছে! আমি আবার সেই গানটা ঠিক-ঠিক সুরে গেয়ে শোনালুম, 'সোনার হাতে সোনার কাঁকন কে কার অলংকার / কে জানে তার এ রূপ দিল, সে কোন মণিকার!' এইসব গান আমার মাথায় খুব থাকে। একেবারে ঠিক-ঠিক সুরে গাইতে পারি। আমার জ্যাঠামশাই তো আমাকে খুব

ভালবাসেন। তিনি বলছিলেন, 'চেষ্টা করলে, তুমি একজন বড় গাইয়ে হতে পারবে।' আমার খুব ইচ্ছে করে সঙ্গীতশিল্পী হতে। আসরে বসে গান গাইব রাতের পর রাত। হাজার-হাজার শ্রোতা। একটা গান শেষ হতেই তাঁরা চিৎকার করবেন, 'আর-একটা, আর-একটা!'

আমার গান শুনে পিয়ালি বলেছিল, 'তুমি খুব পেকেছো।'

তারপর আমরা নাগরদোলায় চেপেছিলুম। সেই আমার প্রথম। কী ভয়! একটা জোড়া চেয়ারে বা দোলায় আমরা পাশাপাশি। বাঁই-বাঁই ঘুরছে পাকের পর পাক। এত ভয় যে, পিয়ালিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছি। পিয়ালিরও বোধ হয় ভয় করছিল। সেও আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। সেই কথাটা রোজই আমার মনে পড়ে। চারপাশে কত আলো, লোকজন, শব্দ, চিনেবাদাম ভাজার, গরম জিলিপির গন্ধ। নাগরদোলা হুস করে ওপরে উঠছে, সব ছোট-ছোট হয়ে যাচ্ছে, আবার ছিটকে নেমে আসছে নীচে, তখন মনে হচ্ছে এই বুঝি আছড়ে পড়ব মাটিতে। মাথা ঘুরছে, বুকের কাছটায় খালি-খালি। এক সময় ঘুরপাক থেমে গেল। নেমে পড়লুম আমরা। পিয়ালি বলল, 'কী সাংঘাতিক!' এর পর আমাদের আবার খিদে পেয়ে গেল। তখন গরম জিলিপি। যা ইচ্ছে, তাই করেছিলুম আমরা সেই রাতে, বড়লোকের মতো। তারপর হাঁটতে-হাঁটতে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরের পাশ দিয়ে, নির্জন বটতলা দিয়ে আমরা শীলদের বাগানের গেটের সামনে গিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলুম। ভেতরে বিশাল একটা বাড়ি। কখনও-কখনও কেউ এসে থাকে। একটা ঝিল আছে। মাছ আছে অনেক। ফুল আর ফলের গাছে ভর্তি। দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে পিয়ালি বলেছিল, 'জানিস, ভূত আছে এখানে। অনেকে দেখেছে।' বলেই, পিয়ালি দৌড় দিল। সে ছুটছে, আমি ছুটছি। পিয়ালি হরিণের মতো দৌড়য়। আমি পিছিয়ে পড়ছি, কিছুতেই ধরতে পারছি না। ভীষণ ভয়! এই বুঝি আমাকে ভূতে ধরল! কঙ্কালের হাত পিঠে এসে পড়ল বুঝি! পিয়া-পিয়া বলে চিৎকার করছি, দুষ্টু মেয়ে শুনেও শুনছে না। একটু পরেই শ্মশান, গঙ্গার ধার, বাঁশগোলা। পোড়া-পোড়া, পচা পচা গন্ধ বেরোবে। আরও ভয়ের জায়গা। ওখানে একটা ছোট্ট মন্দির আছে। মা মঙ্গলচন্ডীর। শান্ত, সুন্দর মূর্তি। হাসি-হাসি মুখ। পিয়ালি সেই মন্দিরের রকে গিয়ে বসে পড়ল। কত রাত হয়ে গেল, পিয়ালির খেয়ালই নেই। বসে-বসে গান গাইছে, 'মা, আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল।' এইবার তো বাড়ি না গেলে

পিটুনি খেতে হবে। কে কার কথা শোনে! আজ তো উৎসবের দিন। একদিন বাড়ি না ফিরলে কী হয়! 'বোস-বোস, আমার পাশে বোস।' পিয়ালি বাবু হয়ে বসে খুব গান গাইছে। একেবারে বিভোর। মন্দিরের পুজারিণী ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। লালপাড়, গেরুয়া শাড়ি। কপালে এতখানি লাল টিপ। এলো চুল। 'কে মা তুমি! এত সুন্দর গান গাইছ?'

পিয়ালি বলল, 'আমি তোমার মেয়ে গো!'

সন্ন্যাসিনী কেঁদে ফেললেন। এতে কান্নার কী হল! পিয়ালির পাশে বসেছেন। বড়-বড়, টানা-টানা চোখ। পিয়ালি যত গাইছে, তিনি তত কাঁদছেন। শেষে আমার চোখেও জল এসে গেল। আকাশে সপ্তমীর চাঁদ। শেষ আশ্বিনের হিম-হিম হাওয়া। মন্দিরের পেছনে ঝুপড়ি গাছ। একটা পেঁচা কেঁও-কেঁও করে ডেকে উঠল। দূরে শবযাত্রীর দল হরিধ্বনি দিতে-দিতে চলেছে। খোল-খত্তাল বাজছে। মন্দিরের ভেতর থেকে ফুল আর ধূপের গন্ধ ভেসে আসছে। একটা চাপা আলোয় ভেতরটা ছমছম করছে।

পিয়ালির পাগলামি শুরু হল। 'মন্দিরের দরজা খুলে দাও মা, আমি অঞ্জলি দেব।' সন্ন্যাসিনী তখন ভাবে বিভোর, 'দেবো বইকী মা! নিশ্চয় দেবো মা।' পিয়ালি ভেতরে ঢুকে গেল! মা মঙ্গলচণ্ডীর পায়ের কাছ থেকে ফুল তুলে নিয়ে সেই ফুলেই অঞ্জলি দিতে লাগল। সে এক দৃশ্য; পিয়ালি আসনে বসে চোখ বুজিয়ে দুলছে সাপের মতো। মূর্তির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে-থাকতে মনে হল, চোখের পাতা পিটপিট করছে, ঠোঁট নড়ছে।

সেই রাত আমি যেমন কোনওদিন ভুলতে পারব না, সেইরকম এই বুধবারটাও আমি কোনওদিন ভুলতে পারব না। মাস্টারমশাইয়ের বাড়িটা বিশাল, সেই তুলনায় লোক অনেক কম। ভীষণ নির্জন, অন্ধকার-অন্ধকার। দালান পেরিয়ে অন্দরমহলে যাওয়ার দরজা। দরজা পেরোলেই দোতলায় যাওয়ার সিঁড়ি। সিঁড়িটা তেমন চওড়া নয়। দোতলায় উঠে বারান্দা টানা। একপাশে সব ঘর। যে-ঘরটা সবচেয়ে বড়, সেই ঘরে আমাদের ক্লাস। চারজন আমার আগেই এসেছে। তাদের মধ্যে একজন মেয়ে। সব মেঝেতে বসে গেছে সার-সার। মাস্টারমশাই পড়ানো শুরু করে দিয়েছেন। আমিও বসে পড়লুম।

একটু পরেই যে ঘরে ঢুকল তাকে দেখেই আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। পিয়ালি! নীল ফুল-ছাপ ফ্রক। পিঠে ঝুলছে জোড়া বিনুনি।

পিয়ালি একটু আলাদা হয়ে বসল। মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করলেন, 'দেরি করলে কেন! ঠিক সময়ে আসার চেষ্টা করবে।'

বেশি না, এক থেকে দেড় ঘণ্টার মতো পড়াবার পর মাস্টারমশাই আমাদের ছুটি দিয়ে দিলেন। দালান, রক, চণ্ডীমণ্ডপ তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। সেই অন্ধকারে আমার হাত চেপে ধরে পিয়ালি বলল, 'মেয়েদের চিঠি লিখতে নেই, তা জানো কি?'

এ-কথাটা আমারও জানা ছিল, তবু বোকার মতো জিজ্ঞেস করলুম, 'কেন বল তো?'

'বড়রা জানতে পারলে রাগ করবে।'

'জানতে পারবে কেন? এ তো তোর আর আমার প্রাইভেট ব্যাপার।'

'সেটা অবশ্য ঠিক। তবে বেশি লিখবে না। তা হলে তোমার লেখাপড়ার ক্ষতি হবে। এবারের পরীক্ষায় অঙ্কে একশোর মধ্যে একশো পেলে তোমার চিঠিটার উত্তর দেব।'

'একশোর মধ্যে একশো? জীবনে পাব না। মেরে-কেটে চল্লিশ। অঙ্কে আমার মাথা ভাল না।'

'তা হলে উত্তরও পাবে না!'

পিয়ালি আমার হাত ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। আমি সেই অন্ধকারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম একা। ওপাশে মা-দুর্গার কাঠামো। পায়রাদের নড়াচড়ার শব্দ। মনে হল, আমি মাটি ছেড়ে ক্রমশই ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছি নাগরদোলায় চেপে। মা-দুর্গার কাঠামোর দিকে এগিয়ে গিয়ে বললুম, 'মা, মানুষ তো সবই পারে, আমি কেন পারব না মা? আমাকে একটু অঙ্কের মাথা দাও না মা! এতে তোমার তো কোনও ক্ষতি হবে না। আমার একটু লাভ হবে।' আচ্ছা ঠিক আছে, আমি লড়ে যাব। বুলেট যদি পারে আমিও পারব। আমি পারব পিয়ালির জন্য। পিয়ালি আমার মা-দুর্গা। পানপাতার মতো মুখ, টানা-টানা চোখ, গায়ে ফুলের গন্ধ, গলায় পুঁতির মালা। ও আমাকে একটা শর্ত দিয়েছে, একটা চ্যালেঞ্জ। সামনের পুজোয় আবার 'আমরা 'পাঁচ মাথার' মেলায় যাব।

॥ ৪ ॥

ক্লাসে বুলেট যেমন বসত শেষ বেঞ্চে, সেই রকমই বসে আছে। মাস্টারমশাইরা এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না, বুলেটের লেখাপড়ায় কোনও উন্নতি হয়েছে!

দুষ্টুমি একটু কমেছে, এই যা, আর কিছুই তেমন হয় নি। আমাদেরও সেইরকমই মনে হচ্ছে। আগের পিরিয়ডে বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। ইতিহাসের ক্লাসে একটা প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারে নি। অংকের ক্লাসে সামান্য একটা ত্রৈরাশিক অংক করতে পারলো না। সার খাতা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। আমাদের ফার্স্ট বয় সেকেণ্ড বয়ের কানে-কানে কী বলল, দু'জনেই হেসে গড়িয়ে পড়ল। একটাকে কংসের মতো দেখতে, আর-একটা যেন দুর্যোধন।

বুলেট তা হলে কী করছে! পুরোটাই বোলচাল। ধাপ্পা মারল আমাকে! বুলেটকে যে আমি ভীষণ ভালবাসি। আমার দু'জন মাত্র বন্ধু, বুলেট আর পিয়ালি। বুলেটকে যে আমি গুরু করব ভেবেছিলুম। বুলেট আমাকে শুধু কায়দাই দেখাল, কাজের কাজ কিছু দেখাতে পারল না! রোজই ভাবি বুলেট আজ ক্লাসে একটা খেল দেখাবে। কোথায় কী! মাস্টারমশাইরা ওকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেন, 'লেখাপড়া তোমার হবে না বাপু, কেন অকারণ সময় নষ্ট করছ, বাবার বিজনেসে ঢুকে পড়ো।'

বুলেট দাঁত বের করে বোকার মতো হাসে। তখন আমার আরও খারাপ লাগে। ওই সময় মনে হয়, বুলেট ক্রমশই যেন জড়বুদ্ধি হয়ে যাচ্ছে। ফাইনাল পরীক্ষার আর মাত্র এক মাস বাকি।

ক্লাসের শেষে এক দিন বুলেটকে জিজ্ঞেস করলুম, 'কী রে, কিছুই তো হচ্ছে না! আমরা তা হলে হেরেই যাব!'

বুলেট বলল, 'তাই তো মনে হচ্ছে। তোকে তো অংকে একশোর মধ্যে একশো পেতে হবে!'

'কী করে জানলি?'

'পিয়ালি আমাকে বলেছে।'

'তুই চিনিস?'

'চিনব না! আমরা একসঙ্গে কত খেলেছি! আমরা দু'জনেই তো খুব ডাকাবুকো ছিলুম। সারা দুপুর শীলদের আমবাগানে বসে থাকতুম। পিয়ালি ভাল গান গায়।'

'তোর সঙ্গে রোজ দেখা হয়!'

'আগে হত। এখন আর হয় না। শোন পলাশ তোকে আমি আগেও বলেছি আজও বলেছি ক্লাসে আমি কোনওদিনও পড়া পারব না। ইচ্ছে করেই পারব না। মার খাব, বেঞ্চের ওপর দাঁড়াব। সবাই আমাকে খারাপ ছেলে,

ব্যাড বয় বলবে। লেট ফাইনাল পরীক্ষা কাম দেন আই উইল সি। সেই রেজাল্টের জন্যে অপেক্ষা কর।'

'যদি না হয়!'

'একটা কারণে না হতে পারে, সেই কারণটা হল অনিমেষকে সব সারই খুব ব্যাক করেন, বড়লোকের ছেলে তো!'

'তোরাও তো বড়লোক।'

'ধুর, শুধু পয়সায় কী হয়, আভিজাত্য থাকা চাই। নীল রক্ত। তা ছাড়া খারাপ ছেলে বলে আমার ভীষণ বদনাম। সবাই তো আমার শত্রু! তবে জেনে রাখিস, আমি হারব না। স্বামীজির চারটে লাইনের ওপর আমার জীবনটাকে দাঁড় করিয়েছি। শুনবি?

If the Sun by the cloud is hidden a bit.

If the welkin shows but gloom.

Still hold on yet a while, brave heart.

The victory is sure to come.

'ওয়েলকিন মানে কী?'

'মানে আকাশ।'

বুলেট চলে গেল। আমাদের খেলার মাঠে ভলিবল শুরু হয়েছে। হইচই। কান পাতাই দায়। বাড়িও আজ জমজমাট। জ্যাঠামশাই চাকরিতে বড় প্রমোশন পেয়েছেন। খাওয়ানো দাওয়ানো হবে। মাংস কষা হচ্ছে। গন্ধ একেবারে পাগল করে দিচ্ছে। আমাদের বাড়িতে মাঝে-মাঝে যখন এইরকম উৎসব হয় তখন বেশ লাগে। 'পড়তে বোস, পড়তে বোস' বলে বড়রা তখন আর মোটেই উৎপাত করেন না। যে যা পারো, করো। গল্প করো। খেয়ে-খেয়ে বেড়াও। একটু মাংস চাখো। এক চামচে চাটনি। একটা মিষ্টি।

আমার কিন্তু এইসব আজ একেবারেই ভাল লাগছে না। কী আশ্চর্য! বুলেট কেমন করে জানল, ওয়েলকিন মানে আকাশ। আমি কেন জানি না অঙ্কে আমাকে একশো পেতেই হবে। পিয়ালি তা হলে আমাকে একটা চিঠি লিখবে। সেই চিঠিতে তার মনের কথা থাকবে। আর সেই চিঠিটা থাকবে আমার বুক পকেটে। গাছের তলায় বসে পড়ব। নীল আকাশ এক সময় ধূসর হয়ে আসবে। একটা চাঁদ, অনেক তারা। ট্রেন চলে যাওয়ার শব্দ। কেউ কোথাও নেই।

একা আমি। আর ওই চিঠিতে এমন একজন, যে আমার কথা ভাবে। ভীষণ ভাবে। সত্যি ভাবে।

আমার ভেতরে কে যেন নড়েচড়ে উঠল। পারতে আমাকে হবেই। ভাল ছেলে না হলে দাঁড়াতে পারব না জীবনে। একদিন তো বড় হবই, তখন তো নিজেকে নিজেই চালাতে হবে। সামান্য মাইনের চাকরি, ভাল করে খেতে পাই না, পরতে চাই না, ভাঙা গাল, ময়লা জামা, বগলে একটা চটের ব্যাগ, ছেঁড়া ছাতা, কারও কাছে কোনও সম্মান নেই, সেই অবস্থাটা কি খুব ভাল হবে! অনিমেষ আমেরিকায়, বুলেট জার্মানিতে, রুপেন ফ্রান্সে, কেমন লাগবে তখন আমার!

বাড়ি থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলুম। কোনও মহাপুরুষের দর্শন পাব না! মাথায় একবার হাত রেখে বলবেন, 'তোর বুদ্ধি খুলে যাক।' ও সব রামায়ণ-মহাভারতের কালে হত। একালে মহাপুরুষ নেই, সবাই মহানায়ক। ঘিচিরমিচির দোকানপাট, কিচিরমিচির লোক। পর-পর সাতটা ক্যাসেটের দোকান। সাত রকম গান বাজছে। কোনওটাই বোঝার উপায় নেই। শুধু শব্দ। পানীয়ের দোকানে বিচ্ছিরি-বিচ্ছিরি মানুষের ভিড়। দুটো ছেলে মারামারি করছে। একটা টিভির সামনে কত মানুষের ভিড়। হিন্দি সিনেমা হচ্ছে। একটা মেয়ে নাচছে। মহাপুরুষ কোথায়! কে আমাকে শেখাবেন ভাল ছেলে কেমন করে হওয়া যায়! গুন্ডা কী করে হওয়া যায় এখনই শিখিয়ে দেবে। খারাপ হয়ে যেতে মাত্র তিনদিন সময় লাগবে। ওই তো পরেশ দাস বসে আছে, সঙ্গে কিছু চেলা জুটিয়ে দেবে। ঘরবাড়ির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক থাকবে না। ড্রাগের নেশা, খুন খারাবি, কোনও ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, ভবিষ্যৎ নেই, মহা আনন্দ।

মন যখন খুব খারাপ হয় তখন আমি রুপেনের বাড়ি যাই। মাঠের ধারে ছোট্ট একটা বাড়ি। টিনের চাল। রুপেনের খুব গাছের শখ। চালের ওপর লতিয়ে উঠেছে বোগেনভেলিয়া। বাড়িটাকে ঘিরে রেখেছে নানারকমের পাম গাছ। এক সময় রুপেনদের খুব বড় বাড়ি ছিল। মামলা-মোকদ্দমায় সব গেছে। রুপেনের বাবার প্যারালিসিস। কোনওরকমে একটু হাঁটতে পারেন তাও লাঠি ধরে। খুব ভাল অভিনয় করতেন থিয়েটারে। আমি গেলেই যত পুরনো দিনের কথা, দানীবাবু, অর্ধেন্দুবাবু, শিশিরবাবু, অহীন্দ্রবাবু। খুব ভাল লাগে শুনতে। রুপেনের দিদি সারাদিন একটা সেলাই মেশিনে বসে গলগল করে সেলাই করেই যাচ্ছেন, করেই যাচ্ছেন সারাদিন। এর থেকে যা রোজগার

হয়, আরও কিছু এদিক-ওদিক, এইভাবে সংসার চলে ; কিন্তু কারও কোনও দুঃখ নেই। সবাই হাসছে, গান গাইছে, মজার-মজার কথা বলছে। এরই মাঝে রুপেন পড়ছে। ছোটদের পড়াচ্ছে। জীবজন্তুর সেবা করছে। গাছ পুঁতছে।

রুপেন বলল, 'পিয়ালিকে তুই অত পাত্তা দিচ্ছিস কেন ?'

'আমার ভাল লাগে। মনে হয় সব সময় ওর কাছে থাকি।'

'আমাদের তো এইরকম মনে হয় না !'

'কী করব, আমার মনে হয়।'

'মরেছে, তুই তা হলে শিল্পী হবি। শিল্পীদের এইরকম হয়। এইরকম যার মন, সে অঙ্কে একশো পেতে পারে না। পিয়ালি তোকে একটা বাজে শর্ত দিয়েছে, যাতে তুই কেটে যাস। ও মেয়ে খুব একটা সুবিধের নয় বলেই মনে হচ্ছে। পলাশ, খুব সাবধান। ওসব মাথা থেকে হটা। তেড়ে লেখাপড়া কর। আমরা তো বড়লোক নই, লেখাপড়া না করলে পরে আর খেতে পাব না। উপোস করে মরতে হবে।'

'রুপেন, অঙ্কে আমাকে একশো পেতেই হবে।'

'তুই তা হলে বুলেটের কাছে যা। সে নাকি এবার ফার্স্ট হবে !' অন্ধকারে রুপেনের হাসি শোনা গেল। বিশ্রী হাসি। রুপেনেরও বিশ্বাস হচ্ছে না। আমার খারাপ লাগল। রুপেনও অনিমেষদের দলে ভিড়ে গেছে। আমি কিছু বলতে চাই না। আমি পারব কি না জানি না, তবে আমার বিশ্বাস বুলেট পারবে। বুলেটের মাথা আছে। বুলেট স্বামীজিকে ধরেছে। আমার মতো কোনও পিয়ালিকে ধরেনি।

রুপেনদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বুলেটদের বাড়িতে গেলুম। রাতের দিকে ওদের বাড়ি খুব জমজমাট। সারাদিন যে যেখানে ছিলেন সব ফিরে এসেছেন। বড়দের প্রত্যেকেরই পেল্লায় ভুঁড়ি। থলথলে শরীর। ঘোলা-ঘোলা চোখ। গাঁক-গাঁক করে কথা বলেন। ছোটগুলো ভয়ংকর দুরন্ত। সারাবাড়ি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। ভাঙছে, ছুঁড়ছে। চিল—চিৎকার করে কাঁদছে। মাঝে-মাঝে মায়েরা এসে বেশ করে পিটিয়ে দিচ্ছেন। এক মিনিট তিষ্ঠনো যায় না। এইসব পেরিয়ে বুলেটের গুহায় গিয়ে ঢুকলুম।

বুলেট পড়ছিল। বই থেকে চোখ না তুলে বলল, 'কী রে, তুই এই সময়ে ?'

'আমি তোর কাছে থেকে পড়ব।'

'কেন ?'

'বাড়িতে আমার মন বসছে না।'

'এখানে এলেই বসবে ?'

'তোকে দেখে।'

'এখানে হবে না পলাশ। আমি একা থাকতে চাই। তুই কিছু মনে করিসনি, যা করা যায় না, আমি তাই করার চেষ্টা করছি। হবে কিনা জানি না। যদি না পারি তা হলে আমি আত্মহত্যা করব।'

'আমিও তো করতে চাইছি।'

'তুই তোর মতো করে কর। আমি আমার মতো করে।'

বুলেটের গুহা থেকে বেরিয়ে এলুম। রাগে সারা শরীর জ্বলছে। বুলেট নকশা দেখাচ্ছে। যত না পড়ছে তার চেয়ে কায়দা বেশি। তোমার কিসসু হবে না বুলেট। যতই কায়দা দেখাও। কায়দায় কিছু হয় না। এক বছরের পড়া এক মাসে হয় না। সবাই স্বামীজি নয়।

রাগে জ্বলতে-জ্বলতে গঙ্গার ধারে। একেবারে ফাঁকা। কেউ কোথাও নেই। হু-হু বাতাস। অন্ধকারে নৌকো ভেসে যাচ্ছে। ঘাটের সিঁড়িতে বসলুম। বন্ধুবান্ধব সব বাজে। কেউ কারও নয়। অনেকক্ষণ বসে রইলুম চুপচাপ। ঘাটের কাছে একটা নৌকো বাঁধা। টিমটিম করে লণ্ঠন জ্বলছে। জলে আলো কাঁপছে। রান্না চাপিয়েছে দূর দেশের কোনও মাঝি। পেঁয়াজ রসুনের গন্ধ। একটু পরে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়বে ছইয়ের তলায়। সারারাত ঢেউয়ের দোলায় নৌকো দুলবে। এদের জীবন কত সুন্দর! অংক, ইতিহাস, জীবনবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, কোনও কিছুরই ধার ধারে না। শুধু ভেসে যায় এক জায়গায় থেকে আর-এক জায়গায়। আজ এই ঘাটে নৌকো বাঁধে, তো কাল ওই ঘাটে। অনেক রাত হয়ে গেল। উঠে পড়লুম। বাড়িতে এতক্ষণে অনেক লোক এসে গেছেন। খুব খাওয়াদাওয়া হচ্ছে। জ্যাঠামশাই প্রোমোশন পেয়েছেন, পথে আসতে আসতে মনে হল, মায়ের চেয়ে আপনার তো কেউ নেই। মাকে বলব, কেন আমার মনে এত অশান্তি! ব্যাপারটা কিছু নয় হয়তো। আমি হয়তো পাগল হয়ে গেছি। যত চেপে রাখব ততই আমার পাগলামি বাড়বে। একমাত্র মা—ই পারেন আমাকে ভুলিয়ে দিতে।

অনেক রাত হল শুতে। এক পাশে মা, এক পাশে আমি। মাঝখানে একটা

পাশবালিশ। মাথার কাছের জানালাটা খোলা। ফুরফুরে বাতাস আসছে। অনেকক্ষণ উসখুস করে, শেষে মাকে বললুম, 'ঘুমোলে নাকি!'

'দাঁড়া, অত সহজে ঘুম আসবে! লক্ষ-গণ্ডা চিন্তা।'

'মা, তুমি আমাকে ভালবাসো?'

'তোর কী মনে হয়!'

'বাসো। তোমাকে একটা কথা বলব!'

'ব্যাডমিণ্টনের র‍্যাকেট কেনার টাকা তো!'

'না। আমার মনটাকে ঠিক করে দেবে!'

'মনে আবার কী হল?'

'তুমি পিয়ালিকে চেনো?'

'কেন চিনব না! পিয়ালির মা আমার সঙ্গে স্কুলে পড়ত।'

'পিয়ালি আমার বন্ধু।'

'তোর বন্ধু তো আমি কী করব!'

'আমার খুব মন খারাপ।'

'মন খারাপ করে কী করবি! পিয়ালির বাবার অফিস এখান থেকে উঠে বোম্বাই চলে যাচ্ছে। ওদের তো যেতেই হবে। এখানে পড়ে থাকলে কে দেখবে! তা ছাড়া এই বাজারে একটা মানুষ দুটো সংসার কী করে টানবে! বোম্বাই অনেক ভাল শহর, ওখানে ওরা ভালই থাকবে!'

আমি যেন আকাশ থেকে পড়ে গেলুম। পিয়ালিরা চলে যাচ্ছে! আমি কিছুই জানি না।

'কবে ওরা যাচ্ছে মা!'

'কাল দুপুরে। গীতাঞ্জলিতে। এই তো সন্ধের একটু পরেই পিয়ালি এসে দেখা করে গেল। আমি তখন খুব ব্যস্ত ছিলুম। কথা বলার সময়ই ছিল না। তোকে একটা বই দিয়ে গেছে। ওই টেবিলের ওপর আছে।'

মায়ের হাই উঠল। শ্বাস-প্রশ্বাস ভারী হয়ে এল। সাবধানে বিছানা থেকে নেমে এলুম। অন্ধকারে ঠিক ঠাহর হচ্ছে না। জানালার কাছে টেবিল। আন্দাজে টেবিল-আলোটা জ্বালালুম। সত্যিই একটা বই। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি। একটা কাগজ উঁকি মারছে পাশ থেকে। গীতাঞ্জলিরই কবিতার ছ'টা লাইন,

পিয়ালি,

অনেক দিন তোকে দেখিনি মনটা আমার ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। বুঝেছি, তোরা আর এই বাঙলায় আসবি না! জানিস তো, আমি আর বুলেট নতুন স্কুলে ভর্তি হয়েছি।

পুরনো স্কুলটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।

ছেলেরাই এখন মাস্টারমশাইদের কান ধরে ওঠবোস করায়। মাস্টার-মশাইদের দুটো দল হয়েছে, কংগ্রেস, কমুনিস্ট। সে বেশ মজা। পড়াশোনার বদলে কাজিয়া হচ্ছে রোজ। কিছু ভাল ছেলে খুব খারাপ হয়ে গেছে। বাজে পাল্লায় পড়ে নেশা ধরেছে। সেদিন বুলেটের সামনে একটা ছেলেকে আমি একাই খুব পিটিয়েছি। পিয়ালি তোর আশীর্বাদে আমার গায়ে খুব জোর হয়েছে। মারামারির কায়দাটা নিজের থেকেই বেশ ভাল শিখে গেছি। জানিস তো! ঘুসি যদি ঠিক মতো জমান যায়—একটা আপার, একটা আণ্ডার, দুটো ঘুসির মাঝের ফাঁকটা যদি কমান যায়, বদাম বদাম, তাহলে আর কোনো কথা নেই। জিতবই জিতব। বুলেট আমাকে বকসিং শিখতে বলেছে। হয় তো শিগগির কোনো ক্লাবে ভর্তি হব। এই সবই আমি তোর জন্যে শিখছি পিয়ালি। তোর ওপর যদি কেউ কোনো দিন অত্যাচার করে, তাহলে তাকে আমি যমের বাড়ি দেখিয়ে দোবো। পিয়ালি, আর তো না বলে পারছি না, আমি যে তোকে ভীষণ ভালবাসি। শোন, আমি তোকে নিয়ে একটা কবিতা লিখেছি। দেখ তো কেমন হয়েছে:

মেঘের যেমন জল,
নদীর যেমন তরঙ্গ
ফুলের যেমন গন্ধ
পিয়ালি পলাশ অন্তরঙ্গ ॥

একটু একটু হয়েছে, কী বল? তুই যদি আর কারোকে ভালবাসিস তা হলে আমি আত্মহত্যা করব। আমাদের নতুন স্কুলটা কেমন শুনবি না! ভীষণ ভাল। ঝক-ঝকে নতুন বাড়ি। রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের মতো ডিসিপ্লিন। মাস্টার-মশাইরা খুব কড়া। বুলেট একেবারে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে সকলকে। আর আমি তার চেলা। নিজের কথা নিজের মুখে বলি কী করে! তুই চলে আয়না পিয়ালি! নিজের দেশ ছেড়ে তোর বিদেশে পড়ে থাকতে ভাল লাগছে। বোম্বাই কী এমন ভাল জায়গা রে!

পরের দিন। খুব ভোরে আমার ঘুম ভাঙে। সেই সকালেই চিঠিটা ডাক বাক্সে ফেলে এলুম। পিয়ালি উত্তর দেবে না আমি জানি। খুব অহংকারী মেয়ে। আমার কিছুতেই অহংকার আসে না। অহংকার থাকলে মানুষের সঙ্গে মেশা যায় না। পিয়ালিকে ভাল না বাসলে চিঠি লিখতুম না কিছুতেই। পড়তে বসার আগে ডায়েরিতে লিখলুম, আমাকে যে ভাবেই হোক পিয়ালির উপযুক্ত হতে হবে। আমাকে নিয়ে পিয়ালি যেন গর্ব করতে পারে। বলতে পারে, আমার পলাশ যে সে ছেলে নয়। আমি একজন মস্ত বড় বিজ্ঞানী হব। হবই হব। কেউ আমাকে রুখতে পারবে না।

রোজই আমি এই সব লিখি, আর আমার শরীরে বিদ্যুৎ তরঙ্গের মতো অদ্ভুত একটা তরঙ্গ খেলা করে যায়। মাথাটা চন চন করে ওঠে। ভীষণ একটা শক্তি পাই। আমাদের নতুন স্কুলটা ভীষণ ভাল। ক্লাসের ছেলেরা সবাই আমাদের বন্ধু। মাস্টারমশাইরা খুব ভাল পড়ান। স্কুলে কোনো পলিটিকস নেই। খুব সুন্দর একটা লাইব্রেরি আছে। ল্যাবরেটারিটা সুন্দর।

দেখতে দেখতে শীত এসে গেল। বিকেলে ক্লাবে গিয়ে অতনুদার কাছে বকসিং শিখছি। বালির বস্তায় নাক মেরে মেরে নাকটাকে প্রায় ভেঙে এনেছি। প্রথম প্রথম চোখে জল এসে যেত। এখন আর সে সব কিছু হয় না। বেশ সহ্য হয়ে গেছে। ঘুসির জোর বেড়েছে। কবজি মোটা হয়েছে। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নিজেই মুগ্ধ হয়ে যাই। বুকটা চওড়া হয়েছে, মুখটা ভারি হয়েছে। কাঁধের পেশি দুটো ফুলে উঠেছে। ভীষণ সাহস বেড়ে গেছে। দুনিয়ার কারোকে আমি আর ভয় পাই না।

মা বলেছিল, বকসিং করলে মাথা মোটা হয়ে যায়। অতনুদা বললে, ভুল কথা মাথা খুলে যায়। সত্য কথা। আগে একটু আধটু যাও বা ভুলে যেতুম, এখন আর ভুলি না। মাস্টার মশাইরা বলেন, পলাশের ফটোগ্রাফিক মেমারি। এই মেমারিটা যদি বজায় রাখতে পারে, তাহলে ও একটা কিছু হতে পারবে। তুমি রেগুলার মৌরলা মাছ খেয়ে যাও, ওতে খুব ফসফরাস আছে।

জানুয়ারির পয়লা চলে গেল। এ বছর আর তোর সঙ্গে আশ্রমের কল্পতরু উৎসবে যাওয়া হল না। আমি একা একা গিয়েছিলুম। কেবলই মনে হচ্ছিল তুই আমার পাশেই আছিস। এই সব উৎসবের দিনে তোর কথা ভীষণ-ভীষণ মনে পড়ে। তোর মনে পড়ে কী না জানি না। মেয়েদের মন ছেলেদের চেয়ে

অনেক শক্ত মনে হয়। সব ছেড়ে থাকতে পারে। হাসতে পারে, গাইতে পারে। ঠিক আছে, তুই তোর মতো থাক।—ইতি

চিঠির পর চিঠি গেল, একটাও উত্তর নেই। কয়েকদিন হাড়কাঁপানো শীতের পর রোদ ঘুরে গেল, দিন বেশ একটু বড় হল, দক্ষিণ থেকে সেই বাতাস এল যে, বাতাসে কোকিল ডাকে।

দুপুরবেলা আমাদের চিলেকোঠায় বসে এক মনে পড়ছি। আজকাল পড়তে বসলে, আর আগের মতো মন ছটফট করে না, বেশ তন্ময় হয়ে যাই। এখন একটা ঝোঁক এসেছে, জানতে হবে, আরো জানতে হবে। পড়ছিলুম জীবন বিজ্ঞান। হঠাৎ পেছন দিক থেকে আমার চোখ দুটো কে টিপে ধরল। হাতে হাত রেখে বুঝতে পারলুম মেয়ে। মেয়ে!

এত জোরে চিৎকার করেছি যে পাশের বাড়ির লোক চমকে উঠেছে —'পিয়ালি!' পিয়ালি চোখ ছেড়ে আমার মুখ চেপে ধরেছে।

'ষাঁড়ের মতো চিৎকার করছো কেন!'

ঠোঁট চাপা অবস্থায় আমি বু বু করছি। আমার ভেতরটা লাফাচ্ছে। পিয়ালি অনেক বড় হয়ে গেছে। চুল বড় হয়েছে। কায়দা করে খোঁপা বেঁধেছে। হাতে সুন্দর গন্ধ। স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে। পিয়ালি এসেছে। আমার পিয়ালি। আনন্দে অজ্ঞান হয়ে যাব। মনে হচ্ছে পা দুটো জড়িয়ে ধরি। মনে হচ্ছে, কেঁদে ফেলি। কী যে কী ভেবে পাচ্ছি না।

পিয়ালি ঠোঁটটা ছাড়তেই, আমি তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ফেললুম। মাছ দেখেছি মাছ। পুকুর থেকে তুলে ডাঙ্গায় রেখেছে। খাবি খাচ্ছে। কী মনে করে মাছটাকে আবার জলে ছেড়ে দিলুম। উঃ, তখন তার কী আনন্দ। ওলট পালট খেতে খেতে জলে তলিয়ে গেল। রুপোলি মাছ। আমিও যেন তলিয়ে গেলুম সেই রকম। পিয়ালি আমার নদী।

পিয়ালি নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছে আর বলছে, 'পাগল হয়ে গেলে না কী! কাকিমা দেখতে পেলে কী বলবে!'

মা এসে দেখুক না, দেখুক। আমার কোনো ভয় নেই। পিয়ালিকে ভালবাসি, ভালবাসি, ভালবাসি। আই লাভ পিয়ালি। ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাস টিকিট কেটে পিয়ালিকে নিয়ে বেড়াতে যাব উত্তর ভারতে। নৈনিতালের লেকের ধারে চাঁদের আলোয় হি হি শীতে ঘুরে বেড়াব। পিয়ালি আরো একটু বড় হয়ে যাবে ততদিনে। পিয়ালিকে একটা লং কোট পরাব। যে কোট বড়

লোকেরা পরে। মাথায় একটা স্কার্ফ বাঁধবে। পায়ে সাদা উলের মোজা। কোথা থেকে টাকা আসবে সে সব আমি জানি না। ও সব ভাবতে নেই।

আমি যদি ভাল করে পাস করতে পারি, গবেষণা করে ডি এস সি হতে পারি, আমেরিকায় যেতে পারি, তাহলে আমার অনেক টাকা হবে, সেই টাকায় আমি একটা বাংলো ধরনের বাড়ি কিনব। চারপাশে খুব বড় একটা বাগান থাকবে। ভাল ভাল গাছ। একটা নকল নদী এঁকে বেঁকে বয়ে যাবে এধার থেকে ওধার। বড় বড় রাজহাঁস রাজার মতো ঘুরে বেড়াবে। এখানে ওখানে দোলনা থাকবে। পিয়ালি দুলবে। পাথর বাঁধান বসার বেদি। একটা টোম্যাটো রঙের ঝক ঝকে গাড়ি থাকবে গ্যারেজে। মুরসুমী ফুলের বেড়। জানলায় জানলায় ঝুলবে হাল্কা নীল রঙের পাতলা-পাতলা পর্দা। ঘরের মেঝেতে রোদের নকশা।

পিয়ালি বলছে, 'তুমি যদি আমাকে না ছাড় তাহলে হাত কামড়ে দোবো।'

'কামড়া। দেখি তোর দাঁতে কত জোর!'

'কেন তুই বুঝছিস না, কেউ এসে পড়লে কী হবে?'

'তোর মনে পাপ ঢুকেছে পিয়ালি। তুই বড় হয়ে গেছিস।'

'এক আমি বড় হইনি. তুমিও বড় হয়েছ পলাশ।'

কথাটা ঠিকই বলেছে পিয়ালি। আমিও বড় হয়েছি। যথেষ্ট বড়। ব্যায়াম আর বক্সিং করার ফলে আমি যতটা না বড় হওয়া উচিত ছিল, তার চেয়েও বড় হয়ে গেছি।

চেয়ারে এসে বসলুম। সামনে আমর বইপত্তর খোল। পিয়ালি এগিয়ে গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়িয়েছে। যে পিয়ালি আমার সঙ্গে মাঠে ময়দানে দৌড়তো. গাছের ডাল ধরে দোল খেত, নাগরদোলায় আমাকে জড়িয়ে ধরে বসত, এ-পিয়ালি সে-পিয়ালি নয়।

পিয়ালি বললে. 'তোমার কাছে আসতে আমার ভয় করবে।'

'কেন? আমি বাঘ না ভাল্লুক।'

'আমি এলে তোমার লেখা পড়ার ক্ষতি হবে।'

'কেন?'

'নিজেই ভেবে দেখ।'

'দেখেছি, কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। তুই যদি একবার বলিস, আমি তোকে ভালবাসি তাহলে আমি পরীক্ষায় ফার্স্ট হব। তোর জন্যেই আমি

ভাল হয়েছি। আমি বিজ্ঞানী হব। গবেষণা করব। আমি এত বড় হব যে, আমার কথা বলতে তোর গর্ব হবে। আর তা যদি না হয়, তুই আমার সঙ্গে কথা বলবি না। কোনো দিনও না। আমার নামে কুকুর পুষবি।'

'তোমার এত মনের জোর?'

'হ্যাঁ, আমার মনের এত জোর। তুই শুধু একবার বল, আমি তোকে ভালবাসি।'

পিয়ালি জানালার কাছ থেকে সরে এল। একেবারে আমার সামনে। আমার কানের কাছে ঠোঁট এনে ফিস ফিস করে বললে, 'আই লাভ ইউ।'

'ভালোবাসি ভালোবাসি'
এই সুরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাঁশি।
আকাশে কার বুকের মাঝে
ব্যাথা বাজে
দিগন্তে কার কালো আঁখি আঁখির জলে যায় গো ভাসি
সেই সুরে সাগরকূলে বাঁধন খুলে
অতল রোদন উঠে দুলে।
সেই সুরে বাজে মনে
অকারণে
ভুলে যাওয়া গানের বানী, ভোলা দিনের কাঁদন হাসি॥

'গানটা শুনবি পিয়ালি? আমার কাছে ক্যাসেট আছে।'

'এখন গান শোনার মন নেই। সারা রাত ট্রেনে জেগে জেগে এসেছি;'

'ঘুমলি না কেন?'

'ট্রেনে কেউ ঘুমোয়! কত নতুন নতুন জায়গা দিয়ে ট্রেন যাবে কত স্টেশন, লোক, পাহাড়, গাছ, এইসব আমাকে দেখতে হবে না। জানতো চলন্ত ট্রেনের পাশ দিয়ে যখন গাছ ছুটে যায়, কেমন একটা গান গেয়ে যায়, ঝুস, ঝিম্, ঝিন্।'

'গাছ তো ছোটে না, ছুটে যায় ট্রেন।'

'সে তো যারা অঙ্কের মাস্টার, তারা বলবে, ট্রেন ছোটে বলেই, গাছ ছোটে উল্টো দিকে। আমি বলব, আমার মতো করে, গাছ, পালা, ঘর, বাড়ি, স্টেশন, সব উল্টো দিকে ছুটে ছুটে পালাচ্ছে। সারা রাত জেগে জেগে জানালার ধারে

বসে এই সব দেখেছি। কেউ জানে না, দু'ভাঁড় 'চায়ে গরম' খেয়েছি। আবার এই দেখ না চুড়ি কিনেছি।'

পিয়ালি কাছে সরে এল। গোল-গোল হাতে লাল, নীল চুড়ি।

'কিসের রে? কাঁচের?'

'কাঁচের নয় গালার, সহজে ভাঙবে না।'

পিয়ালি আমার পাশেই বসে রইল। এখন আর তেমন ভয় পাচ্ছে না। আমার হঠাৎ অমন পাগলামি করা উচিত হয়নি। কী করব! না করে পারিনি। মনে কর, আমি ঈশ্বরকে খুব ডাকছি। রোজ ডাকছি, কেবল ডাকছি পাগলের মতো। হঠাৎ ভগবান যদি আমার সামনে চলে আসেন একটা মেয়ের রূপে ধরে, আমি কী করব! যা করব, তাই করেছি।

'বোম্বাই জায়গাটা কেমন রে?'

'খুব, খুউব সুন্দর। তবে কী জানতো, বম্বে গিয়ে আমি বড় হয়ে গেলুম।'

'কেন হলি?'

'ধুর, সেখানে মাঠ নেই, গঙ্গা নেই, মা মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির নেই। আমার ছোটাটাই বন্ধ হয়ে গেল, আর তাই আমি বড় হয়ে গেলুম। যত ছুটবো, তত ছোট থাকবো। বয়েস ধরতে পারবে না। দেখ না, কেউ আমাদের ধরলে ছটফট করলেই ছেড়ে দেয়।'

'তোর যত সব থিওরি!'

'যাবে না কী কোথাও?'

'কোথায় যাবি?'

'অনেকদিন যে সব জায়গায় যাওয়া হয়নি, সেই বেলতলার মাঠ। কায়েন-দের বাগানের পাশ দিয়ে গঙ্গার ধারের মোচ্ছবতলা হয়ে মা মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির।'

'চল, চল, আমিও তো যাইনি অনেকদিন। সেই তোর সঙ্গেই তো যেতুম ওই সব দিকে।'

'তোমার পড়ার ক্ষতি হবে না?'

'ক্ষতি কেন হবে? আমার তো সারাটা রাত পড়ে আছে।'

'তুমি কত রাত অব্দি পড়?'

'দুটো তো বটেই।'

'ঘুমোয় কতটুকু! শরীর খারাপ হবে না!'

'ভাবলেই শরীর খারাপ হয়, না ভাবলে কিছুই হয় না।'

রাতে আমার ঘুম এল না। সবাই ঘুমোচ্ছে। মায়ের নিঃশ্বাস পড়ছে জোরে জোরে। ঘড়ির পেণ্ডুলামের ঠকাস ঠকাস শব্দ। মাথার দিকের জানালাটা খোলা। কালো আকাশ পর্দার মতো ঝুলছে। তারার ফুলকি। সন্ধ্যেটা আজ খুব সুন্দর কেটেছে। মোচ্ছবতলায় বটগাছের বেদিতে বসেছিলুম আমরা অনেকক্ষণ। পিয়ালি তখন আমাকে একটা অদ্ভুত কথা বলেছিল,

'তুমি কী ওই রকবাজ ছেলেদের মতো?'

'এ কথা বলছিস কেন? তোর কী তাই মনে হয়?'

'আজকালকার ছেলেরা খুব অসভ্য হয়। মেয়েদের দিকে বিশ্রী ভাবে তাকায়। যা তা কথা বলে।'

'তুই যদি আমাকে সেইরকম ভাবিস তাহলে আমার যত মন খারাপই হোক তোর সঙ্গে আর মিশব না।'

পিয়ালি আমার হাত দুটো চেপে ধরেছিল। আমার গালে গাল ঘষে বলেছিল, 'রাগ করছো কেন? জানতো, আমি এখনো ছোট, কত ছোট! কিন্তু বড়রা আমাকে ছোট থাকতে দিচ্ছে না।'

'সে আবার কী! জোর করে বড় করে দেবে না কী!'

'সে সব খুব খারাপ ব্যাপার, তোমাকে বলতে আমার লজ্জা করবে। তুমি বুঝে নাও।'

'তুই বলার আগেই আমি বুঝে ফেলেছি। বুলেট কী বলে জানিস, মানুষে যেমন শয়তান আছে সেইরকম ভগবানও আছে।'

'আমার খুব কষ্ট হয় পলাশ! কী খারাপ লাগে!'

ঘুম তো আসছে না, কেবল ভাবনা আসছে। পৃথিবীটা এত সুন্দর, মানুষ কেন এমন জঘন্য হয়ে যাচ্ছে। এই যে আমাদের পাড়ার মুস্তাফী। সে একটা পাণ্ডা। রাজনীতি করে, ব্যবসা করে আর জেনেশুনে স্কুল কলেজের ছেলেদের ড্রাগের নেশা ধরায়। লোকটার কী পাওয়ার! থানা, পুলিস কিচ্ছু করতে পারবে না কোনোদিন। এখন দেশের না কী এইরকমই নিয়ম। চোর দারোগার সঙ্গে খানা খাবে। ওই মুস্তাফীর সঙ্গে কারো মতের অমিল হলে সে খুন হয়ে যাবে। যাবেই যাবে। জ্ঞানী, গুনী, শিক্ষিত মানুষও তাকে খাতির করে চলে।

এমন যদি একটা দেশ থাকত, যেখানে সুন্দর সুন্দর বাড়ি, দু'সার গাছের মধ্যে দিয়ে পরিষ্কার বাঁধানো রাস্তা চলে গেছে। বিশাল মাঠ ঘেরা সুন্দর একটা স্কুল আর কলেজ। সব মানুষই যে-দেশে খুব বড়লোকও নয় গরিব লোকও নয়। মাঝামাঝি। সেই সব লোক এত ভাল, যে কেউ কারো খারাপ চিন্তা করে না। হেসে কথা বলে। ঝগড়া মারামারি করে না। সবাই ভীষণ ভাল। লেখাপড়া, গান বাজনা, নাটক এই নিয়েই তারা থাকে। কেউ চাকরি করে, কেউ ব্যবসা করে, কেউ কারখানা চালায়। সবাই খুব পরিশ্রম করে। কাজ করে, গান গায়, গল্প করে, মাঝে মাঝে চা খায়। কেউ কারো পর নয়, সবাই আপন। সে দেশে মেয়েদের খুব সম্মান। ছোটদের কেউ মারে না। মায়েরা কখনো রাগে না। মেয়েতে মেয়েতে খ্যাঁক খ্যাঁকে গলায় ঝগড়া হয় না কোনো বাড়িতে। সন্ধ্যে যেই নামে চারপাশে আলো ঝলমল করে ওঠে। মন্দিরে বাজে কাঁসর ঘণ্টা। বাড়িতে বাড়িতে সবাই সুর করে প্রার্থনা গায়। রবীন্দ্রনাথের গান,

আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ', সত্যসুন্দর ॥
মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগনমাঝে,
বিশ্বজগত মনিভূষণ বেষ্টিত চরণে ॥

সঙ্গে ঢিং ঢিং করে ঘণ্টা বাজবে। ধূপ-ধুনোর গন্ধ। প্রত্যেকটা বাড়ির সঙ্গে একটু করে বাগান থাকবে। করবী, কল্কে আর টগর ফুলের গাছ যেন অবশ্যই থাকে। কেরালার ছোট মাপের নারকোল গাছ। সেই শহরে ধুলো উড়িয়ে গাঁক গাঁক গাঁক করে যেন লরি না যায়। ছোট ছোট, ঝকঝকে সুন্দর মটর গাড়ি চলতে পারে। রাস্তার ধারে ধারে ঘাসে ঢাকা জমি থাকবে। কোথাও এতটুকু ধুলো, আবর্জনা, জঞ্জাল, ছাই, আনাজের খোলা থাকবে না। রাস্তার মুখ খোলা কল দিয়ে ছ্যাড় ছ্যাড় করে অকারণে জল পড়ে যাবে না। একটা খুব ভাল লাইব্রেরি থাকবে। অনেক অনেক বই থাকবে সেখানে, জীবনী, ভ্রমণ কাহিনী, জ্ঞান বিজ্ঞানের বই। খুব ভাল একটা মঞ্চ থাকবে। সেই মঞ্চে মাঝে মাঝে ভাল নাটক হবে। চারপাশ বাঁধানো বড় একটা দীঘি থাকবে। ধারে ধারে সিমেন্ট বাঁধানো বসার আসন, বড় বড় গাছের ছায়া। এইরকম একটা দেশে আমি আর পিয়ালি থাকব। ওই কলেজে আমরা দু'জনে হব অধ্যাপক আর অধ্যাপিকা। কেন? এমন হতে পার না, না কী। আর দশটা বছর।

এইবার আমার ঘুম আসছে। নীল রঙের ঘুম। নীল রঙের ঘুম খুব ঠাণ্ডা হয়। বরফের দেশ থেকে আসে। উত্তর মেরু কী দক্ষিণ মেরু থেকে। যেখানে শুধু বরফ আর বরফ। অসীম নিস্তব্ধতা। বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ! সাদা শঙ্খচিলের ঝাঁক। টলে টলে হাঁটছে পেঙ্গুইন। ডানায় তালি বাজাচ্ছে ফটফট শব্দে।

বুলেট ক্লাসের শেষে বললে, 'পলাশ একটা গল্প লিখতে পারিস!'

'গল্প তো কোনোদিন লিখিনি।'

'লিখিসনি তো কী হয়েছে, আমি বলছি, তুই লিখবি। আজ রাতের মধ্যে লিখে কাল সকালে আমাকে দিবি।'

পিয়ালিকে সন্ধ্যেবেলা বললুম 'কী হবে! একবার তো তুই আমাকে ফেলমার্কা ছেলে থেকে পাসমার্কা করলি, এইবার বুলেট বলছে, তোকে গল্প লিখতে হবে। গল্প কেন লিখতে হবে বল তো?'

'নিশ্চয় কোনো কারণ আছে! বিনা কারণে বুলেট কিছু করে না, করায় না। আমার মন বলছে, তুমি লিখতে পারবে! তোমার মধ্যে গল্প আছে।'

'আমি ডন-বৈঠক মারি, বকসিং করি, আমার মাথায় গল্প আসবে কী করে!'

'আসবে, আসবে আসবে। আমি বলছি আসবে।'

ঝিম মেরে অনেকক্ষণ বসে রইলুম ছাতে। গল্প অনেক পড়েছি। গল্প কেমন করে লেখে তা তো জানি না। এ কী শাস্তি! বুলেট তো নিজে লিখলেই পারত। বুলেট পারে না এমন কাজ নেই। শীতের প্রথম। চাঁদ উঠেছে থালার মতো। হালকা কুয়াশা। শেষ রাতে জমাট হবে। মা চিৎকার করে বললে, 'জ্বরে পড়ার ইচ্ছে হয়েছে বুঝি।'

মাকে ঢিপ্ করে একটা প্রণাম করলুম।

'কী হল! প্রণাম করলি হঠাৎ!'

'কারণ আছে। তুমি একটা কড়া আশীর্বাদ কর।'

মা আমার মাথায় হাত রেখে চুল এলোমেলো করে দিল। আমি জানি, মায়ের আশীর্বাদে ছেলে সব কিছু করতে পারে। লেখা পড়ায় যখন পেছিয়ে পড়েছিলুম, সবাই বলেছিল, হয়ে গেল। একটা মাত্র ছেলে তাও মানুষ হল না। মা আমাকে বলেছিল, দেখিস, আমি বলছি, আমার ছেলে কখনো খারাপ হতে পারে না।

আটটার সময় চিলে কোঠার আমার পড়ার ঘরে বসলুম। জয় বাবা বিশ্বনাথ, জয় বাবা বুলেট নাথ, জয় বাবা পিয়ালীনাথ, জয় আমার মা। প্রথম কাগজটা নষ্ট হল। দু-প্যারার পর মনে হল, এগোচ্ছে না। আবার শুরু করলুম। তারপর আর খেয়াল নেই। যখন কাক ডাকছে, তখন খেয়াল হল গল্প শেষ। গল্পটা বুলেটকে দিতেই বললে, 'পড়, আমাকে পড়ে শোনা।'

আমাদের একটা বাড়ি ছিল। বাড়িটা খুব পুরনো। আমরা থাকতে থাকতে সেটা আরো পুরনো হল। বেশ বড় বাড়ি। এমাথা থেকে ওমাথা কিছু কিছু ঘরে সারা দিন চিন্ চিন্ করে বালি ঝরে পড়ত। ভেন্টিলেটারে চড়াই পাখির বাসা। সারা দিন তাদের কিঁচ কিঁচ, কাঁচি দিয়ে কাপড় কাটার শব্দের মতো ডাক। বাড়িটার পিছনে ছিল গঙ্গা। সারাদিন ভিজে ভিজে বাতাস। দেয়ালে দেয়ালে নোনাধরা। যেন নানা দেশের ম্যাপ। আমরা ভাই বোনেরা নানা দেশ খুঁজে পেতুম সেই ম্যাপে। কোনোটা অস্ট্রেলিয়া কোনোটা গ্রেট বিটেন, জাপান। গঙ্গার দিকে ঝোপঝাপ একটা বাগান ছিল। বর্ষায় গঙ্গায় যখন ভরা জোয়ার, তখন বাগানে জল চলে আসত। ছোট ছোট ঝোপঝাপ গাছগুলো সব ডুবে যেত জলে। একটা কদম গাছ ছিল। মনে হত, নাইতে নেমেছে জলে। এক গাছ গোল গোল ফুল। আমরা কল্পনার চোখে সেই গাছে শ্রীকৃষ্ণকে যেন দেখতে পেতুম, ডালে বসে বাঁশি বাজাচ্ছেন। বাগানটা জলে ডুবে গেলে আমরা পায়ে সরষের তেল মেখে সেই জলে ছপ-ছপ করে খেলতে নামতুম। মাঝে মাঝে হলুদ সাপ জলে লাট খেত। আমরা একটুও ভয় পেতুম না। জানা ছিল জলে বিষধর সাপ থাকে না। অনেক মাছ ঢুকে পড়ত বাগানে। বেশির ভাগই আড়-ট্যাংরা। ছোটো ছোটো চিংড়ি তিড়িং-বিড়িং করে লাফাত। জল নেমে গেলে পলি পড়ে থাকত। মিহি চিকচিকে। বিজ বিজ করত ছোট ছোট কাংড়া। দু'একটা চিংড়িও লাফাত। পাতার ঝোপে অসহায় আড়-ট্যাংরা। আমারা কোনোটাই ধরতুম না। আড়-ট্যাংরা তো খেতেই নেই। ওরা নোংরা খায়। একবার একটা বিশাল ময়াল সাপ কোথা থেকে চলে এসেছিল। জ্যাঠামশাই বলেছিলেন, সাপটা খুব ভাল মানুষ। ওকে ভয় পাওয়া উচিত হবে না। বাগানের এক কোণে ঝাঁকড়া একটা বকুলের ছায়ায় ছোট, একানে একটা ঘর ছিল। এক সময় এক সাধু থাকতেন ওই ঘরে। জোয়ারের জল ওই ঘরে ঢুকে পড়ত। একটা পাথরের বেদী ছিল। বেদীটা জলে ডুবু ডুবু হয়ে থাকত। আমরা তার ওপর উঠে

খেলা করতুম। জল ভরা ঘরে কথা বললে বেশ গমগম করত। আমাদের মজা লাগত। সাপটা ওই ঘরেই আশ্রয় নিয়েছিল। পুরো একটা দিন ছিল। আমরা দুধ খেতে দিয়েছিলুম। খেয়েছিল। মনে হয় পেট ভরেনি। অতবড় সাপ। ছোট এক বাটি দুধ। কি হবে! নাসা। ছোট একটা হাগল দিলে গিলে ফেলত। ময়ালটা দিনের জোয়ারে এসে রাতের জোয়ারে চলে গেল। সেই থেকে ঘরটার নাম হয়ে গেল ময়াল গুহা। বাগানটায় এত কিছু ছিল, তবু আমরা নির্ভয়ে যেতুম। কেউ আমাদের কিছু বলতেন না। বাবা বলতেন, বিপদের মুখে এগিয়ে যাওয়া উচিত। তা না হলে মানুষ ভীতু হয়ে যায়। জীবন জিনিসটা খুব সহজ নয়। কত কি হবে! কত কি ঘটবে!

আমাদের সেই বাড়িটার নিচের তলায় অনেক ঘর ছিল। সেই ঘরগুলো আমরা ব্যবহার করতুম না। করার প্রয়োজন হত না। তালাবন্ধ পড়ে থাকে বারো মাস। আমরা থাকতুম দোতলায়। আমাদের এক তলায় ইঁদারার মতো বড় একটা কুয়ো ছিল। সেই কয়োর সঙ্গে সুড়ঙ্গ পথে গঙ্গার যোগ ছিল। গঙ্গায় জোয়ার এলে, জোয়ারের জল কুয়োয় এসে ঢুকত। হুড়হুড় করে ভরে যেত। বর্ষায় উপচে পড়ত। তখন ঘটি, বাটি ডুবিয়ে জল তোলা যেত দড়ি বালতির প্রয়োজন হত না। বাড়িটা এমন কায়দায় তৈরি ছিল, ঘরের মধ্যে ঘর, তার মধ্যে ঘর। সে বেশ মজা! আমাদের লুকোচুরি খেলার খুব সুবিধে হত। কে কোথায় লুকিয়ে আছি সহজে ধরা যেত না। অনেক ঘরের কোন ঘরে? সেই ঘরটা আবার কোন ঘরে ঢুকে আছে!

ছাতটা খুব বিশাল ছিল। খেলার মাঠের মতো। পশ্চিমে গঙ্গা। ছাতে উঠলে ওপারটা পরিষ্কার দেখা যেত অনেক দূর পর্যন্ত। ঘাট, মন্দির, বাগান বাড়ি। ছাদে একটা চমৎকার ঘর ছিল। সেই ঘরে সাদা চাদর পাতা একটা বিছানা ছিল। কারো শরীর খারাপ, মন খারাপ হলে, কোনো কারণে রাগ হলে, এই ঘরে এসে শুয়ে থাকত। সবাই বলত গোঁসা ঘর। আমরা যখন কানমলা বা চড়চাপড় একটা দুটো খেতুম, খেতুম যে না, তা তো নয়, ছোটদের একটু দুষ্টুমি করতে ইচ্ছে করবেই, আর বড়দের ধৈর্য কম হবেই, আর বাঁদর, গাধা, উল্লুক বলবেই। তাতেও রাগ না কমলে, কান ধরে টান, গালে ছোটমতো একটা চড়। তাইতেও রাগ না কমলে মাথায় গাঁট্টার তেহাই। চড়-চাপড় বা ছাগল, গাধা, বাঁদর বললে, আমাদের তেমন রাগ হত না। হনুমান বললে

খুশিই হতুম ! জানতুম, ওটা রাগ নয়, ভীষণ একটা আদর। উল্লুক শব্দটায় আমাদের ঘোরতর আপত্তি ছিল। জিনিসটাকে আমরা কখনো কোথাও দেখিনি। আমাদের বাগানে হনুমান আসত। রাস্তায় বাঁদর নাচত। স্কুলের মাঠে গাধাও চরত। উল্লুক জিনিসটা আমরা চোখে দেখিনি। উল্লুকের 'লুক' কেমন জানা ছিল না। ভাল্লুক হলে আপত্তি ছিল না। ভাল 'লুক' মানে ভাল্লুক। উৎকট লুক মানে উল্লুক। উল্লুকের সঙ্গে কানমলা খুবই অপমান-জনক। যেমন ঝোলে গাঁদাল পাতা। আর উল্লুক কথাটা বেশী ব্যবহার করতেন আমাদের কাকা আর মাস্টারমশাই। যাকে বলতেন, সে অমনি গোঁসা ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিত। অতবড় বাড়ি। অত ছেলেমেয়ে, লোকজন। গোঁসা-ঘরে কে চলে গেল তখনই কারো খেয়াল হত না। ধরা পড়ত খাওয়ার সময়। গুণেগুণে পাত পড়ত। একটা কেন খালি ! খোঁজ, কোথায় গেল। প্রথমেই গোঁসা ঘরে অনুসন্ধান। উপুড় হয়ে পড়ে আছে বিছানায়।

চল্, মা ডাকছে, খেতে দিয়েছে।

যা, যা খাবো না।

চল্।

যাবো না আ আ।

কথায় আছে, ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে। হাত ধরে টানতে গেল। খামচা খামচি, ঝটাপটি। কেস আরো খারাপ দিকে চলে গেল। সে ফিরে গিয়ে যা নয় তাই বলে নালিশ করে দিলে, আমাকে লাথি মেরেছে। গালে আঁচড়ে দিয়েছে। বলেছে, যা যা, মা আমার সব করবে। মায়ের মেজাজ সেই সময় ভাল থাকলে কিছু নয়। মা নিজেই গিয়ে, অভিমান ভাঙিয়ে নিয়ে আসবে। অভিমানীর তখন এক আলাদা ডাঁট, যেন জামাই বসছেন খেতে। সবচেয়ে বড় মাছের টুকরোটা তার পাতে। চার চামচে চাটনি বেশি। মানে বেশি আদর, বেশি খাতির। তিনি যেন খেতে বসে সকলকে ধন্য করছেন। আর যদি মায়ের মেজাজ চড়া থাকে, তাহলে হয়ে গেল। মা সমান ঝাঁঝিয়ে বলবে, না খাবে, না খাবে। ক'দিন আর না খেয়ে থাকবে ! পেটের জ্বলা ধরলে ঠিক নেমে আসবে। আমার দিদি একবার টানা তিন দিন ওই গোঁসাঘরে ছিল। দিদির কানের একটা দুল অসাবধানে কি ভাবে হারিয়ে গিয়েছিল। মা দিদিকে বলেছিল, পেতনী। এই পেতনী কথাটা দিদি খুব অপছন্দ করত। বাঁদরী বললে তেমন রাগ করত না। দিদিকে দেখতে তো খুব সুন্দর ছিল ! তাই

পেতনী বললে ভীষণ রেগে যেত। আর মা দিদিকে মাসে অন্তত একবার পেতনী বলবেই। ভূত বললেও হয়। ভূতরা নাকি সবাই পুরুষ। দিদি গোঁসাঘরে চলে গেল। খাওয়ার সময় মা বলবে, 'যা, মহারানীকে ডেকে আন।' ডাকতে গেলুম। দিদি ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'পেতনীরা ভাত খায় না। মাঝরাতে পেঁচা ধরে খায়। যা. তোর মাকে বলগে যা।' আমি এসে মাকে বললুম। একটু বাড়িয়েই বললুম, 'তোমার মেয়েকে তুমিই ডেকে আনো। আমাকে মিচকেপটাশ, দালাল, এইসব বলেছে।' মা বললে, 'তা তো বলবেই। কি যুগ পড়েছে দেখতে হবে তো। অন্যায় করব আবার চোখও রাঙাবো। যদ্দিন ইচ্ছে, তদ্দিন না খেয়ে থাক। পেটের জ্বালা ধরলে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে আসবে।' আমি সঙ্গে সঙ্গে মায়ের কথাটা দিদিকে গিয়ে রিপোর্ট করে দিলুম। একটা শব্দ বেশি যোগ করে। ল্যাজের জায়গায় বললুম, 'কুকুরের মতো ল্যাজ নাড়তে নাড়তে আসবে।' ব্যাপারটা খুব ঘোরালো হয়ে গেল। দিদির ঝাড়া দু'দিন উপোস, মায়েরও দু দিন। মেয়ে না খেলে মা খায় কি করে! শেষে দিদি দেয়ালে লিখলে 'আর একবার সাধিলেই খাইব।' তিন দিনের দিন জ্যাঠাইমা স্পেস্যাল রান্না করে মা আর মেয়েকে পাশাপাশি বসিয়ে আদর করে খাওয়ালেন। সরু চালের ভাত মাছের ঝোল। আমড়ার অম্বল। পোস্ত। আমরা সবাই জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগলুম দু'জনের অনশন ভঙ্গের দৃশ্য। কাকিমা আমাদের শিখিয়ে দিচ্ছেন. মহাত্মা গান্ধী দিনের পর দিন অনশন করতেন। ভঙ্গের দিন রামধুন গাওয়া হত। তোরাও সবাই মিলে গা, রঘুপতি রাঘব রাজারাম। মা আর মেয়ের সেকি ভাব! মেয়ের পাত থেকে মা কাঁচা লঙ্কা তুলে নিচ্ছে।

অনেক খাট-পালঙ্ক ছিল। তবু আমাদের শোয়ার ব্যবস্থা ছিল মেঝেতে। বাবা বলতেন, ছাত্র-ছাত্রীরা সব ব্রহ্মচর্য পালন করবে। একটু কষ্টে থাকবে। সাধারণ খাবার খাবে। বাবুগিরি করবে না। সত্যকথা বলবে। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠবে। দুপুরে ঘুমোবে না। ছোট ছোট করে চুল ছাঁটবে। দশ আনা ছ' আনা ছাঁট চলবে না। তারমানে কিছু বড় কিছু ছোট চলবে না। সব সমান মাপ। সেই ছাঁটের নাম ছিল. কদমছাঁট। একটা বিশাল বড় ঘর ছিল। সেইটাকে বলা হত দক্ষিণের ঘর। সেই ঘরে মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত লম্বা, সাতটা জানালা আর তিনটে দরজা ছিল। সেই ঘরটাকে বলা হত হল ঘর। সেই দূর অতীতে যাঁরা বাড়িটা তৈরি করিয়েছিলেন, তাঁরা এই হলঘরে

বসে, নাচ, গান, বাজনা করতেন। সেই ঘরের মেঝেতে মা একটা ঢালাও বিছানা করে দিতেন। একটা করে মাথার বালিশ। তাঁবুর মতো বিশাল এক মশারি, টান টান করে খাটানো। সেই বিছানায় আমরা সব কটা ভাইবোন পাশাপাশি। মাঝে মধ্যে গৃহযুদ্ধের মতো, মশারির মধ্যে আমাদের মশারি যুদ্ধ হত। শুরুটা হত খুব সামান্য ভাবে। পায়ে পায়ে লড়াই। শেষে হাতাহাতি। সব শেষে মশারির দড়ি ফড়ি ছিঁড়ে প্রলয়কাণ্ড। সেইখানেই শেষ নয়। শেষের পরেও একটা শেষ থাকত, যেটাকে বলে অবশেষ। সেই অবশেষে বড়দের আগমন। প্রথম যে শুরু করেছিল তাকে সনাক্তকরণ। বিচার। সাক্ষীসাবুদ। আত্মপক্ষ সমর্থনে দোষীর হাঁউমাউ। সব শেষে বিচারকের রায়, বাঁদরটার সাতদিন সব খেলাধুলো বন্ধ। সকাল থেকে রাত শুধু পড়বে আর কড়া কড়া অঙ্ক কষবে।

সেই মেঝের বিছানায় বালিশে মাথা রেখে শুতে শুতে দিদি একদিন আবিষ্কার করলে, ঘরটায় নিচে যে তালাবন্ধ ঘরটা, সেই ঘরে কে যেন একটানা সংস্কৃত মন্ত্র পড়ে চলেছে। তখন অনেক রাত। দিদি আমাকে ফিশফিশ করে ডাকছে, 'পিলু, পিলু, বালিশে কান পেতে শোন।' হ্যাঁ, সত্যিই তাই। কে একজন ভারি গলায় মন্ত্র পড়ছে। পরপর তিনদিন একই সময়ে আমরা সেই শব্দটা শুনলুম। মাঝরাত থেকে শুরু করে সেই ভোররাত পর্যন্ত। দিদি খুব সাহসী ছিল। চারদিনের দিন দিদি বললে, 'চল পিলু, আমরা দেখে আসি। ব্যাপারটা কি!'

আমি বললুম, 'আমার ভীষণ ভয় করবে।'

'ভয় করবে? তুই না ছেলে? চল, পা টিপে টিপে, টর্চ হাতে যাবো। আমি তো আছি।' পাঁচ সেলের টর্চ হাতে দিদি আগে আগে, পায়ে পায়ে আমি। দিদির ফ্রকের পেছনটা ধরে আছি। মনে হচ্ছে, ঘুরে ঘুরে প্যাঁচালো সিঁড়ি দিয়ে অন্ধকারের পাতকুয়ায় নেমে চলেছি। আলোর রেখা ধরে। নিচেটা হিম হিম। সাতশো ঝিঁঝি পোকা একসঙ্গে ডাকছে। অন্ধকার যেন কাঁপছে। বাইরে, গঙ্গার দিকের বাগানে কদমের ডালে বসে ডাকছে প্যাঁচা, যেন রাতের অন্ধকার করাত দিয়ে কাটছে। গাছের পাতায় বাতাসের ঝুপঝাপ শব্দ। লম্বা একটি গলি। দু'পাশে রক। সারি সারি তালা বন্ধ ঘর। ওপর থেকে যে-ঘরটায় মন্ত্র পাঠ হচ্ছিল বলে ধারণা, সেই ঘরের দরজায় কিন্তু বিশাল একটা পেতলের তালা ঝুলছে দেখা গেল। ভয়ে বুকটা ছাঁত করে

ল! দিদি পা টিপেটিপে এগোচ্ছে। নিজে দরজায় কান রাখল। নকক্ষণ ধরে কি শুনল! আমাকে ইশারায় ডেকে কান পেতে শুনতে বল। ঘরের ভেতরে সত্যিই অদ্ভুত একটা শব্দ হচ্ছে। যেন দশবারটা ভুমো মরা একসঙ্গে ভোন্ ভোন্ করছে। গভীর, গম্ভীর, ওঁকারধ্বনির মতো। দি টর্চ নিবিয়ে রেখেছে। ঘোর অন্ধকারে গায়ে গা লাগিয়ে, কান পেতে জনে শুনছি। ভীষণ ভয় করছে। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, শীত করছে। জার পাশেই একটা জানালা ছিল। ভেতর থেকে বন্ধ! দিদি কি মনে করে নালাটা ঠেলতেই একটা পাল্লা দড়াস করে খুলে গেল। এত সহজে খুলে ব আমরা ভাবতেও পারিনি। সুন্দর একটা গন্ধ বেরিয়ে এল খোলা নালা দিয়ে! অন্ধকারে উঁকি মেরে মনে হল, ঘরের মেঝেতে কেউ বসে ছেন। সাদা মতো। শব্দটা সেই মূর্তি থেকেই আসছে। দিদি ঝট্ র টর্চ লাইটটা টিপল। হঠাৎ আলোয় ঘরটা যেন চমকে উঠল। আমরা াক হয়ে দেখালুম, ঘরের মেঝেতে একটা আসন পাতা রয়েছে, আর কোথাও হু নেই। মানুষের মূর্তি আমাদের চোখের ভুল। দিদি যেই টর্চটা ালো, সঙ্গে সঙ্গে মনে হল মূর্তিটা আছে। আলোয় নেই, অন্ধকারে আছে। শরীর পাথরের মতো হয়ে গেছে। দিদিও বেশ ভয় পেয়ে গেছে। ছুটে লয়ে আসতে পারছি না। পা দুটো যেন মেঝেতে থাম হয়ে গেছে। হঠাৎ যেন খুব ভারি গলায় পরিষ্কার বললে, 'যাও, শুয়ে পড়ো।' আমরা তে কাঁপতে ওপরে এসে, দু'জনে জড়ামড়ি করে শুয়ে পড়লুম।

পরের দিন সকালে গিয়ে দেখি, জানালাটা বন্ধ হয়ে গেছে। দিদি মাকে জ্ঞেস করলে, 'ওই ঘরটা কোনো দিন খোলো না কেন মা!'

'ওই ঘরে বসে তোদের দাদু সাধনা করতেন। মৃত্যুর সময় বলে গিয়েছিলেন, রাটা বছর ওই ঘর যেন খোলা না হয়। কেউ যেন না ঢোকে। এখনো বছর বাকি আছে। দু'বছর পরে ওই ঘর খুলে পুজো হবে।'

এদিকে আমাদের কি হল, রাতের ঘুম চলে গেল। মাঝ রাতে বাড়ির ই যখন সুখে ঘুমোচ্ছে, তখন আমি আর দিদি টর্চ হাতে পা টিপে টিপে, স্তে আস্তে নিচে নেমে যেতুম। সেই ঘর। সেই শব্দ। আমাদের আর ভয় ত না। জানালাটা খোলা মাত্রই সুন্দর একটা গন্ধ। অন্ধকার আসনে মূর্তি। আমরা অপেক্ষা করে থাকতুম যদি কোনো কণ্ঠস্বর আসে। প্রথম দিনের মতো, 'যাও শুয়ে পড়ো।'

এসেছিল কণ্ঠস্বর। সে এক ভয়ংকর ইঙ্গিত। 'তোমাদের বাড়িটা থাকে না। গঙ্গা গ্রাস করবে।'

আমরা সে-কথা বিশ্বাস করিনি। এতকালের এত বড় একটা বাড়ি জলে চলে যাবে। দিদি মাকে বললে। মা বললে বাবাকে। বাবা জাঠামশাইকে জ্যাঠামশাই কাকাবাবুকে। সবাই বললেন, গঙ্গা যদি নেনই আমাদের তে কিছু করার নেই। গঙ্গার সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা আমাদের নেই।'

সত্যিই তাই। প্রবল জোয়ারে একটু একটু করে পাড় ভাঙ্গতে ভাঙ্গ প্রথমে গেল সেই সাধুর কুঠিয়া। ভাদ্রমাসের অমাবস্যার রাত। ভাদ্রমা গঙ্গায় ষাঁড়াষাঁড়ির বান আসে। বিশাল তার শক্তি। পরপর দুটো ঢেউ আসে একটা ষাঁড় আর একটা ষাঁড়ী। সেই রাতে বান এল। প্রথম ঢেউয়ে আঘাতেই কুঠিয়ার পাড় ভেঙ্গে গেল। দ্বিতীয় ঢেউয়ের আঘাতে ঘরটা ধ পড়ল ধুস্ করে। আমরা আমাদের ছাতে দাঁড়িয়ে দেখলুম। বেদীঅল অমন সুন্দর ঘরটা ঝুপ করে জলে পড়ে গেল। ঘোলা জল পাক মেরে ছু চলেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। সেই বছরেই বাগানটার তিনের চার অংশ গঙ্গা চলে গেল। বাবা ইঞ্জিনিয়ারকে ডেকে আনলেন। তিনি সব দেখে বললে কিছু করার নেই! গঙ্গা পুব দিকে সরে আসছে। পশ্চিমে চর। পু ভাঙ্গন। তিন লাখ টাকা খরচ করে বাঁধাতে পারেন, তবে টাকাটা জ যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

মাঝরাতে আমি আর দিদি একদিন সেই ঘরের জানলা খুলে অস্পষ্ট, ঝাপসা মূর্তিকে বললুম, 'আমাদের এমন সুন্দর বাড়িটা গঙ্গায় চ যাবে? আপনি কিছু করবেন না? আমাদের কদম গাছ, বকুল গাছ, বেল গা পিটুলিগাছ। খেলার মাঠের মতো অত বড় ছাদ দক্ষিণের হল ঘর ঘরের ভেতর ঘর।'

কোনো উত্তর নেই।

'আপনি অত বড় সাধক। ইচ্ছে করলে আপনি সব পারবেন।'

কোনো উত্তর নেই।

'আর দু'বছর পরে আপনার ঘর তাহলে কে খুলবে!'

এইবার পরিষ্কার শোনা গেল, 'আমার ঘর খুলবেন মা গঙ্গা। আম সাধন, আমার আত্মা তিনি ভাসিয়ে নিয়ে যাবেন সাগরে।'

'যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু,
এবার এ জীবনে
তবে তোমায় আমি পাইনি যেন
সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।'

এর পর পিয়ালির নিজের কয়েকটা লাইন, 'অনেক দূরে চলে যাচ্ছি আমরা। আর কি দেখা হবে! এবারের পুজোর মেলায় নাগরদোলায় চাপবি না। আমি তোর পাশে থাকব না, কে তোকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরবে। ওই মা মঙ্গলচণ্ডীর মন্দিরে তোর নামে পুজো দিয়ে গেলুম। ওখানকার মায়ের কাছে একটা ফুল আছে চেয়ে নিবি। আলুর দম পাওনা রইল। কোনওদিন আবার যদি ফিরে আসি, রেঁধে খাওয়াব। তোর চিঠিটা আমার কাছে সারাজীবন থাকবে। আমার সঙ্গে দেখা করিস নি। সহ্য করতে পারব না। কেঁদে ফেলব।—পিয়ালি।'

অনেক, অনেকক্ষণ বসে রইলুম। টেবিল আলো দেখতে পেল, একটা ছেলে কাঁদছে।

॥ ৫ ॥

একটা ঘণ্টা বাজল। ফাইভ মিনিট্‌স মোর। ইতিহাসের শিক্ষকের গলা। ফার্স্ট বয় অনিমেষ সামনের বেঞ্চে। খাতা রিভাইজ করছে। শেষ ঘণ্টার আগেই টেবিলে খাতা জমা দিয়ে বেশ ডাঁটে বেরিয়ে গেল। বুলেট রোজই আধ ঘণ্টা আগেই খাতা জমা দিয়ে বেরিয়ে যায়। আজও তাই। কী জানি কী করে। আজই আমাদের শেষ পরীক্ষা। পরীক্ষার ক'দিন বুলেট কারও সঙ্গে একটাও কথা বলে নি।

আমার খাতা জমা দিয়ে স্কুলের মাঠে এসে শিশু গাছের তলায় দাঁড়ালুম। শেষ বিকেলের আলোয় সব মাখামাখি। আমার বুক পকেটে কাগজে মোড়া মা-মঙ্গলচণ্ডীর পুজোর সেই ফুল। পিয়ালি পুজো দিয়েছিল আমার নামে। একমাস পরে জানা যাবে, বুলেট পেরেছে কি না। জানা যাবে, আমার অঙ্কে একশো হল কি না! দিন ঢলছে পশ্চিমে।

॥ ৬ ॥

অনেক রাতে লুকিয়ে, লুকিয়ে, টেবিলে বইখাতার আড়াল দিয়ে চিঠিটা লিখে ফেললুম। আমি না লিখে পারছি না। আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। সেই কষ্টটা বোঝাতে পারব না কারোকে। কেউ বুঝতেই চায় না যে আমি বড় হচ্ছি। আয়নার সামনে দাঁড়ালে দেখতে পাই ঠোঁটের ওপর গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। আমি এখন খুব ভাল ফুটবল খেলি। পা দুটো বেশ মোটা মোটা হয়েছে। সেদিন অগ্রনী সঙ্ঘের সঙ্গে ফাইনাল খেলা ছিল আমাদের মিতালি সঙ্ঘের। দু'গোলে হারিয়েছি। তার মধ্যে একটা গোল আমি করেছি। গর্ব করা উচিত নয়, তবে একথা না বলে পারছি না, ওই অ্যাংগল থেকে গোল করা খুব কঠিন কাজ ছিল। তাই বলছি, একটা কারণে আমার কষ্ট হতেই পারে। সেই কারণটা হল পিয়ালি। আমি কিছুতেই তাকে ভুলতে পারছি না যে!

পিয়ালি, আমার পিয়ালি,

তোমাকে আমি লিখছি। এখন রাত বারোটা। বাড়ির সবাই ঘুমোচ্ছে। মা কেবল জেগে আছে বিছানায়। মায়ের আজকাল তেমন ঘুম আসে না। অনেক রকমের চিন্তা নিয়ে মা ছটফট করে। সব চেয়ে বড় চিন্তা, আমি। আমার কী হবে। মায়ের ভীষণ ইচ্ছে, আমি খুব বড় হই। বিরাট চাকরি করি। আমার গাড়ি হবে, বাড়ি হবে, লোকে সম্মান করবে। মাকে আমি বলি, তুমি দেখ না, আমি পারি কী না! আগেই অত ভাবছ কেন! সময় কী চলে গেছে? মা বলবে, যদি না পারিস!

এই যে তোমাকে চিঠি লিখছি, মা জানতে পারলে ভীষণ রাগ করবে। তবু আমি লিখছি। তোমার কথা আমার ভীষণ মনে পড়ছে। তুমি চলে যাওয়ার পর থেকে আমি কেমন যেন পাগলের মতো হয়ে গেছি। অনেকেই বুঝতে পারে। অনেকে জিজ্ঞেস করে, শরীর খারাপ তোর?

শরীর তো খারাপ নয়। মন খারাপ। ভীষণ-ভীষণ মন খারাপ আমার। আর তুমি বলতে পারছি না। এইবার তুই বলি। শোন পিয়ালি, এই চিঠিটা লেখা আমার উচিত হচ্ছে না; কারণ আমি অঙ্কে একশো পাই নি, একাশি পেয়েছি। সেটাও আমার পক্ষে যথেষ্ট। আর উনিশটা নম্বর পেলে, তবেই তুই আমার চিঠির জবাব দিবি, সেকথাও আমি জানি। আর মাত্র উনিশটা নম্বর। পরের পরীক্ষায় সে আমি পাবই পাব। যে-অঙ্ক কেউ ভুল করে না, সেই সরল করাটা আমি বোকার মতো তাড়াহুড়ো করে ভুল করে ফেলেছি।

বাকি সব ঠিকঠাক। বুদ্ধির অংক করার বুদ্ধি আমার খুলে গেছে। কি করে খুলেছে জানিস, বলে হেড দিতে দিতে। মাথার ঘিলু ছলকে গেছে। তোর মা মঙ্গলচণ্ডী আমাকে কৃপা করেছেন।

জানিস তো, বুলেট যা বলেছিল, তাই করেছে। অংকে একশো তো পেয়েইছে. সব সাবজেক্টে ফার্স্ট। আমাদের ফার্স্টবয়ের দাঁত ভেঙে দিয়েছে। মাস্টারমশাইরা ভাবতে বসেছেন। এমনটা কেমন করে হল! আমি জানতুম, বুলেট পারবে, পারবেই পারবে। আমি একটু পেরেছি পিয়ালি, একথা তোকে স্বীকার করতেই হবে। যে কিছুই হত না সে ফোর্থ হয়েছে। জানিস পিয়ালি, তুই আমার স্বপ্নে আসিস, তুই আমার প্রাণে আছিস। ঠিক আছে, এই চিঠিটা পড়ে তুই ছিঁড়ে ফেলিস। উত্তর আমি চাই না। একশো যেদিন পাব, সেদিন উত্তর দিস। ইতি—পলাশ ॥

আলো নিবিয়ে চুপি চুপি মশারির এক পাশটা তুলে বিছানায় উঠে মায়ের পাশে শুয়ে পড়লুম। অনেক চাঁদের আলো বিছানায় এসে পড়েছে। মনে হচ্ছে জলে শুয়ে আছি। মা আমার বুকে একটা হাত ফেলে বললেন, 'চিঠি লেখা হল?' চমকে উঠলুম। মা জেগে আছেন, আর না দেখলেও জানেন, আমি চিঠি লিখছি!

মা বললেন, 'পিয়ালিরা মনে হয় বোম্বাই থেকে চলে আসছে।'

'চলে আসছে? কেন আসছে মা?'

'ওদের লেখাপড়ার অসুবিধে হচ্ছে। মন খারাপ হচ্ছে। ওখানে ভাল বাড়ি পাচ্ছে না। অনেক টাকা ভাড়া।'

'সবাই চলে আসছে?'

'না, পিয়ালির বাবাকে থাকতেই হবে। চাকরি বলে কথা।'

'তাহলে চিঠিটা কি ডাকে দোবো?'

'এত কষ্ট করে রাত জেগে, আমাকে লুকিয়ে লিখলি আর পোস্ট করবি না! তাহলে সবই তো মাঠে মারা যাবে!'

'তুমি রাগ করলে?'

'রাগ করব কেন! তবে তোর বাবা যেন না জানতে পারে। কড়া মানুষ। অন্য রকম ভেবে বসলেই বিপদ।'

'অন্য রকম মানে কি রকম!'

'সেটা বোঝার মতো বয়েস তোমার হয়েছে বাছা।'

'তুমি মনে করবে না কেন ?'

'অনেক আগেই ভেবে রেখেছি, তুই যেদিন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবি, সেই দিন পিয়ালিকে আমি তোর বউ করে আনব। মেয়েটা একটু পাগলি, ভীষণ ভাল লাগে। ওই রকম একটা মন সহজে পাওয়া যায় না। খাঁটি সোনা। একালের মেয়েদের সব দেখছি তো! বেশির ভাগই স্বার্থপর, কুচুটে। নাও, এখন দয়া করে ঘুমোও অনেক রাত হল আর পিয়ালীর কথা বলতে হবে না। ভোরবেলা উঠতে পারবি না।'

মায়ের কোল ঘেঁষে শুয়ে পড়লুম। এই সময়টায় আমার ভীষণ সুখ-সুখ লাগে। পৃথিবীটা যত বড়ই হোক আর ভীষণ হোক আমার মায়ের কোলের কাছে এসে সব ফুলের মতো নরম হয়ে যায়। আমি একটা পায়রা হয়ে যাই। আমি জানি মায়ের কাছে থাকলে আমাকে কেউ কিছু করতে পারবে না। রোজ সকালে মাকে আমি প্রণাম করে আশীর্বাদ চেয়ে নিই। আমি জানি, আমি বড় হবই। কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না। মা বলেছে, নিজের ওপর বিশ্বাস রাখ। যে নিজেকে বিশ্বাস করে ভগবান তাকেই সাহায্য করেন। দূরে কোথাও সানাই বাজছে। সানাই শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লুম।

স্কুলে বেশ একটা হইচই পড়ে গেছে। মাস্টারমশাইরা বলাবলি করছেন, লাস্ট কি করে ফার্স্ট হয়!

'হয়, যে-ভাবে ফার্স্ট একদিন লাস্ট হয়। মানুষের মাথা একবার খুলে গেলে অসাধ্য সাধন করতে পারে। মাথাটাই সব।'

ফার্স্ট বয় আর তার মোসায়েবরা বলতে লাগল, বুলেট টুকেছে। ফার্স্ট হয়েছে। বুলেট টাকা খাইয়েছে! নতুন হেডমাস্টারমশাই আর থাকতে না পেরে একদিন ক্লাসে ওয়ার্নিং দিলেন, 'তুমি এই অপপ্রচার যদি বন্ধ না করো, আমি স্টেপ নিতে বাধ্য হব।'

হেডমাস্টারমশাইয়ের কথা শুনে সে মুখটা একটু বাঁকাল। ভীষণ একটা অবজ্ঞার ভাব। হেডমাস্টারমহাশয়ের নজর এড়াল না। তিনি দুঃখের হাসি হেসে বললেন তুমি শুধু ডিফিটেড হওনি পরোলি ডিমর‍্যালাইজড হয়ে গেছো।'

বুলেট সেই আগের মতোই লাস্ট বেঞ্চে বসে। কোনো অহঙ্কার নেই মাঝে মাঝে পকেট থেকে ছোট্ট একটা কৌটো বের করে জোয়ান খায়। একদিন জিজ্ঞেস করলুম, তুমি কেন ফার্স্ট বেঞ্চে বসো না ?'

এতকাল তুই বলতে বলতে হঠাৎ তুমি বলছিস কেন ?'

'তুই ফার্স্ট হয়েছিস! তাই।'

'আমার লেজ বেরিয়েছে, না ডানা গজিয়েছে?'

'না, তেমন কিছু হয়নি।'

'তাহলে? আমি যেমন ছিলুম তেমনই আছি। শোন পলাশ, ফার্স্টেই বোস আর লাস্টেই বোস, আসল কথা হল চোখ, কান, মাথা, এই তিনটে যে যত খোলা রাখতে পারবে, তার তত উন্নতি। এইটাই আমার জায়গা, এইখান থেকেই আমি বেরবো। শেষ থেকে সামনে যাব। আমি হবই। যেমন, যাবই যাব, করবই করব পারবই পারব।'

সেই দিন ছুটির পর বুলেটকে মুডে পেয়ে জিজ্ঞেস করলুম,

'একটা সমস্যা সমাধান করে দিবি বুলেট!'

'এরিথমেটিক না অ্যালজ্যাবরা?'

'ওসব নয়। একটা মেয়ে। কেউ যদি একটা মেয়ের কথা অনবরত ভাবে, তার কী লেখাপড়া নষ্ট হয়ে যায়!'

'ও সেই মেয়েটাকে তুই কিছুতেই ভুলতে পারছিস না! পিয়ালি? তাই তো!'

'হ্যাঁ।'

'এতকাল তোর কোনো প্লেস ছিল না, এবার তুই ফোর্থ হয়েছিস। তোর ভাল হয়েছে, না খারাপ হয়েছে?'

'ভালই বলতে হবে।'

তা হলে? পিয়ালি তোর ভালই করেছে। পিয়ালিকে সামনে রাখ, আর সব কিছু কর তাকে খুশি করার জন্যে। রেজাল্ট ভাল হলে পিয়ালির আনন্দ হবে। তোর নাম হলে তার গর্ব হবে। তুই যত ভাল হবি সে তত খুশি হবে। পিয়ালিকে দেবীর মতো করে তোর বুকে রাখ। একটা মেয়ে একটা ছেলের অনেক উপকার করতে পারে। সব কিছু নিজের মধ্যে চেপে রাখ, কারোকে জানাবি না। আমি আমার বুকের মধ্যে স্বামীজিকে বসিয়ে রেখেছি।'

'তুই যদি স্বামীজিকে রাখিস, আমি কেন একটা মেয়েকে রাখব!'

'যার যেমন ধাত! আমি কচ-কচ করে কাঁচা লংকা চিবোই। দিনে তিন চার বার চান করি। শীতকালে আদুর গায়ে থাকি। তুই পারবি?'

'না।'

'যার যাকে ভাল লাগবে, সে তাকেই শক্তি করবে। সেইটাই নিয়ম।'

বুলেট সব সময় আশার কথা বলে, সাহসের কথা বলে। সেই কারণে বুলেটকে আমার ভীষণ ভাল লাগে। আমি যখন অশান্তিতে ঘুমোতে পারছি না, কেবলই মনে হচ্ছে, আমি বোধ হয় খারাপ হয়ে যাচ্ছি, এইবার আমি একের পর এক পরীক্ষায় ফেল করব, সেই সময় বুলেট আমাকে বললে, মনে কর পিয়ালি তোর মা দুর্গা। তার কাছ থেকে ভালবাসার শক্তি চা।

আমি তাই পড়তে বসে চোখ বুজিয়ে পিয়ালিকে একবার ভেবে নি। পিয়ালি, আমি পলাশ, আমি পড়তে বসছি। মা বলেছে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলে, তোকে চির কালের জন্য আমার করে দেবে। ভীষণ, ভীষণ ভাল ভাবে পাস করতে না পারলে ভাল চাকরি পাব না। পিয়ালি! তুই আমার সামনে বোস, আমি রাত তিনটে অব্দি পড়ব। যা পড়ব সব যেন মনে থাকে ছবির মতো। বুলেট ফার্স্ট হোক, আমি যেন সেকেন্ড হই।

এই কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভেতরটা চান্ করে ওঠে। যেন ইলেকট্রিক শক লাগলো। তখন আর আমাকে পায় কে! পড়তেই থাকি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আর কোনো দিকে মন যায় না। বারোটা, একটা, রাত দুটো। শেষে মা এসে বিছানায় টেনে নিয়ে যায়।

হেডমাস্টারমশাই এখন নিজে বুলেটের কোচিং-এর দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বুলেটকে একজন মস্ত বড় বিজ্ঞানী করবেন। একজন ফিজিসিস্ট! অঙ্কের মাথা থাকলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য ভেদ করা যায়। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা এখন আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। এই বিশাল সৃষ্টির রহস্যটা কী! ভগবান বলে সত্যিই কি কেউ আছেন! অঙ্কই কী ভগবান!

হেডমাস্টারমশাই বুলেটের মাথায় অঙ্কটা এমন ভাবে ঢুকিয়েছেন বুলেটের ধ্যানজ্ঞানই হয়েছে অঙ্ক। তার সেই পুহাঘরে আমাকে এখন থাকতে দেয় অনেকক্ষণ। ইকমিক কুকারে ভাত, ডাল, আলু, পেঁপে সিদ্ধ হয়। মাঝে মাঝে কাঠকয়লার ছোট্ট চুলোতে আমিই আগুন ধরাই। সমান বয়েস হলেও বুলেট যেন আমার গুরু। বুলেট আমাকে শিখিয়েছে, দেহ পরিচ্ছন্ন রাখলে মন পরিচ্ছন্ন থাকে, তাই সকাল সন্ধে চান করা খুব দরকার। দামী নয় কিন্তু পরিষ্কার জামা কাপড় অবশ্যই পরা উচিত। 'নিজের জামা, প্যান্ট একদিন অন্তর অন্তর নিজেই সাবান দিয়ে কেচে নিবি। গা দিয়ে সব সময় যেন সুন্দর একটা গন্ধ বেরোয়। তেলে ভাজা জিনিস একেবারে খাবি না। আর রোজ সকালে ব্যায়াম করবি। মরার আগের দিন পর্যন্ত করবি।'

বুলেট আরো বলেছে, নির্জন কোনো পথ ধরে একা একা অনেকটা হাঁটবি। হাঁটবি আর ভাববি। নতুন নতুন অঙ্কের সামস্যা তৈরি করে সমাধান খুঁজবি। মনে মনে কবিতা আবৃত্তি করবি।

সেই রকম সুন্দর একটা পথ আছে। দু'পাশে সেকালের বড় লোকদের বাগান বাড়ি। ঝুপড়ি ঝুপড়ি গাছ। পথের শেষে পাঁচশো বছরের প্রাচীন পাঠ বাড়ি। সারা দিন সেখানে নাম গান হয়। পড়ন্ত বেলায় আমি সেই পথ ধরে হাঁটি। পথের দুপাশে ঘাস, ছোট ছোট বুনো গাছ। বাজার দোকান নেই, তাই লোক চলাচলও কম। হাঁটতে হাঁটতে আমি পিয়ালির কথাই ভাবি। কবে তুই আসবি পিয়ালি!

পিয়ালি যেন পাশেই কোথাও আছে। আমার প্রশ্ন শুনে বললে, এলেই বা কী হবে পলাশ, আমি তো তোর সঙ্গে বেড়াতে পারব না। আমার প্রতিজ্ঞা।

এই সময় আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়। শীতের মুখের শীত-শীত বাতাস। শুকনো রাস্তায় ছোট ছোট পাথর। অনেক কালের একটা পোড়ো বাড়িতে এক বৃদ্ধা। কেউ বোধ হয় নেই। আমার সঙ্গে যেচে ভাব করেছেন। দেখা হলেই, বলবেন, এই যে আমার কৃষ্ণ! বেড়াতে যাচ্ছ?

আমাকে কৃষ্ণ বলেন। প্রথমে ভাবতুম, আমি ময়লা বলে ঠাট্টা করছেন। কালোকে কালো না বলে কৃষ্ণ বলাই ভাল। পরে আরো ভাব হতে বুঝে ছিলুম, এই কথাটা তিনি ভাবে বলেন।

একদিন আমাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেলেন। দুটো ঘর আর ঠাকুর ঘরটা ঠিক আছে। ঠাকুর ঘরে, সিংহাসনে দাঁড়িয়ে আছেন কালো কষ্টি পাথরের রাধাকৃষ্ণ। মূর্তি দেখলে, মনে ভাব আসে। বাঁকা করে বাঁশিটা ধরে আছেন।

বুলেট দেখলে খুব খুশি হত। দিদিমা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। খাটের ওপর পরিষ্কার ধবধবে চাদর পাতা বিছানা। ছোট্ট একটা টেবিলে চশমার খাপ। একপাশে মহাভারত, গীতা, ভাগবদ। বাঁধানো একট ডায়েরি। কলম। টুলের ওপর গেলাস ঢাকা জলের কুঁজো। ঘরের মেঝে ঝকঝকে পরিষ্কার। ধূপের গন্ধ।

অনেকটা হাঁটার পর আমি আমার এই দিদিমার বাড়িতে চলে আসি। কত গল্প। ভাল ভাল খাবার। বেলের মোরব্বা, মুড়ির মোয়া, নারকোল নাড়ু, তিলের নাড়ু। বাড়িটা এখন আমার নিজের বাড়ির মতোই হয়ে গেছে।

যখন ইচ্ছে হল বিছানায় একটু গড়িয়ে নিলুম। কৌটো খুলে নাড়ু খেলুম। মহাভারতের খানিকটা পড়ে শোনালুম।

'তুমি এই ভুতুড়ে বাড়িটায় একা একা কী করে থাকো দিদা!'

'না থাকলে কোথায় আমি থাকব কৃষ্ণ? আমার কে আছে বল?'

'কেউ নেই কেন?'

'সবাই মরে গেল। আমার অখণ্ড পরমায়ু।'

'তুমি অনেক অনেক দিন বাঁচো দিদা। আমার জন্যে বাঁচ। আমি তোমাকে দেখব। তোমার কোনো ভয় নেই।'

'এই কথাটা এত দিন আমাকে কেউ বলে নি রে কৃষ্ণ।'

'কি করে বলবে, তোমার এত দিন কী কোনো নাতি ছিল দিদা!'

একা-একা এই বাড়িটায় ঘুরে বেড়াবার সময় কেন জানি না আমার মনে হয় কেবল, পিয়ালি এই বাড়িতে আসবে, বাড়িটা মেরামত করে নতুন করা হবে। বাগানটা আবার সুন্দর হবে। মনে হয়। কেন মনে হয় বলতে পারব না।

॥ ৭ ॥

সেদিন টিফিনের সময় স্কুলে, অনিমেষের দলের ছেলেরা আমাকে খুব টিজ— করতে লাগল। কথাগুলো মোটেই ভাল নয়, 'কী রে বুলেটের পা চাটা! টুকে ফোর্থ। পিয়ালির সঙ্গে নাগরদোলায় চাপবি. পিয়ালি তোকে স্বর্গে নিয়ে যাবে। হালুয়া খাওয়াবে।' বলছে, আর ছোট ছোট ইট ছুঁড়ে মারছে। একজন কাছে এসে মাথায় আচমকা একটা চাঁটা মেরে গেল। আর একটা ছেলে বললে, 'তোর পিয়ালি বোম্বাইতে হিরোইন হতে গেছে। তুই গলায় দড়ি দে।'

সকলেই এক সময় আমার বন্ধু ছিল। গাছের তলায় বসে স্কুল ছুটির পর আমরা কত গল্প করেছি, চানাচুর খেয়েছি, আজ সেই ছেলেগুলোকে মনে হচ্ছে ভিলেন। আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে, তোরা এমন করছিস কেন? আমি আর পিয়ালি তোদের কি ক্ষতি করেছি।

হঠাৎ বুলেট এসে দাঁড়াল সেই জায়গাটায় যেখানে দাঁড়িয়ে সে স্প্রেয়ার দিয়ে রং ছিটিয়ে ছিল। বুলেট চিৎকার করে আমাকে বলল, 'তুই কী মেয়ে! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাচ্ছিস! মারতে পারছিস না।'

'তুই আয় না! যা-তা বলছে এরা।'

'আমি যেতে পারি, যাব না। এটা তোর ব্যাপার।'

অনিমেষের দল চিৎকার করে উঠল। ওদের দলের সবচেয়ে বদ যেটা তার নাম সূর্য। সে একটা পাথর ছুঁড়ল। আমার কানের পাশ দিয়ে চলে গেল। কানের লতিতে লেগেছে। কানের পাশটা গরম হয়ে উঠল। হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল স্বামীজির পরিব্রাজক বেশের সেই ছবি। হাতে একটা লাঠি। স্বামীজি বলেছিলেন, কেউ আমাকে একটা চড় মারলে আমি তাকে চারটে চড় মারব। যে বদমাইশ তাকে ধোলাই দিতে হয়। তাকে ঠাকুর দেবতার কথা বললে কিছু হয় না। ষাঁড়কে বাইবেল পড়ান যায় না। তার শিং দুটো শক্ত হাতে চেপে ধরে মাথাটা মাটিতে গুঁজে ধরতে হয়। দুষ্টের কাছে দুষ্ট, শিষ্টের কাছে শিষ্ট।

বুলেটই আমাকে বলেছিল, যে-কাজে শক্তি লাগে, সেই কাজ করার সময় খুব জোরে দমভর শ্বাস নিবি। মনে মনে তিন বার বলবি, শক্তি, শক্তি, শক্তি। আমি তাই করলুম। আমার সামনে দাঁড়িয়ে, হ্যা হ্যা করে দাঁত বের করে হাসছিল শংকর। পেছনে দাঁড়িয়ে সুবিনয় তাকে তারিফ করছিল। শরীরে যত জোর ছিল, সব এক করে একটা ঘুসি। একটা আলুর পুতুল যে-ভাবে মচ্ করে ওঠে সেইরকম একটা শব্দ হল। শংকরের নাকটা আর নাকের জায়গায় নেই। বাঁ পাশে হেলে গেছে। সুবিনয় কিছু বোঝার আগেই তলপেটে নির্দয় এক লাথি। সুবিনয় মাটিতে। বুলেট বলেছিল, মারামারির সময় নিজেকে ভাববি বৃকোদর ভীমসেন। আর স্পিড। কোনো দয়া, মায়া, ভয় কিছুই রাখবি না মনে। ঝড়ের মতো ঘুরপাক খেয়ে যাবি। সেই টনেডো আমি। এতটা যে পারব, আমি বুঝিনি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব কটা কাত। ভাল ছেলে, সোনার ছেলে অনিমেষ ছুটে পালাচ্ছিল। স্রেফ একটা ল্যাং। মুখ থুবড়ে পড়ল খোয়ার ওপর। ঠ্যাং দুটো ধরে কিছু দূর টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললুম, র‍্যাটস। ঘষড়ানিতে ছাল চামড়া উঠে গেল।

বুলেট বললে, 'চলে আয়, দাওয়াই পড়ে গেছে। কাল থেকে তোর আর আমার কাজ হবে, দেখ মার। এই স্কুলের পুরো দখল আমরা নিয়ে নেবো। এইবার মাস্টারমশাইদেরও ছাড়ব না। কে সেক্রেটারির ছেলে, কে এম এল এ,-এর ছেলে প্রেসিডেন্টের ছেলে, আমরা জানি না, জানতেও চাই না।'

আমাদের দলে তখন অনেক ছেলে। সবাই বলছে, ঠিক করেছিস পলাশ। বড্ড বাড় বেড়েছিল। বুলেট বললে, 'আমরা এখন হেডমাস্টারমশাইয়ের কাছে যাব।'

আমাদের আর যেতে হল না। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে তিনিই ছুটে এলেন সব শিক্ষকদের নিয়ে। অনিমেষের দল কীর্তন শুরু করে দিয়েছে, 'আবার গুন্ডামি স্যার। ওই দেখুন, শংকরের নাকটা আর নাকের জায়গায় নেই। ভদ্রলোকদের স্কুলে এই ছোটলোকদের থাকার অধিকার নেই। যত রাম-শ্যাম, যোদো-মোধোর ছেলে। ইতর, ইললিটারেট।'

অনিমেষের কথা শেষ হওয়া মাত্রই বুলেটের হাত উঠল বিদ্যুৎ গতিতে। ক্র্যাক করে একটা শব্দ। অনিমেষ গাল চেপে বসে পড়ল। হেডমাস্টারমশাই চিৎকার করে উঠলেন, 'বুলেট!'

বুলেট শান্তগলায় বললে, 'বলুন স্যার?'

'এসব কী হচ্ছে?'

'এই তো সবে শুরু স্যার, আরো বাকি আছে। হাটে, ঘাটে, মাঠে, বাজারে স্কুলে, যখন যেখানে দেখা হবে সেইখানেই পেটানি চলবে। বেধরক পেটানি।'

'কারণটা জানতে পারি?'

'নিশ্চয় পারেন। লেখাপড়া না পারার শাস্তি মাস্টারমশাইরা দেবেন। ক্লাসে অসভ্যতার শাস্তি মাস্টারমশাইরা দেবেন। ক্লাসের বাইরে অসভ্যতার সাজা আমাদের হাতে। এরা একটা দল পাকিয়েছে, আমাকে আর পলাশকে টিজ করার জন্যে। আপনার নামে বলে বেড়াচ্ছে, আপনি আমাদের কাছে টাকা খেয়ে পরীক্ষার আগে সব প্রশ্ন আউট করে দিয়েছেন। এই বদনামের পেছনে মদত দিচ্ছেন, আপনার কিছু শিক্ষক, আর সেই শিক্ষকরা বিশেষ একটা দলের রাজনীতি করেন। এই প্রাচীন স্কুলটাকে তাঁরা ধ্বংস করতে চান।'

বুলেটের ঝাঁঝাল কথা শুনে, হেডমাস্টারমশাই কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন। দু'জন শিক্ষকমশাইয়ের মুখ জবাফুলের মতো লাল হয়ে গেছে। হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'তোমরা আমার ছাত্রদের মেরেছ, এটা অপরাধ। জানো আমি তোমাদের স্কুল থেকে বের করে দিতে পারি।'

'যদি ঠিক ঠিক বিচার করতে হয় তাহলে বের করে দিতে হবে ওদের। কারণ ওরাই প্রথমে দল বেঁধে এই একটা ছেলেকে ঠোকরাচ্ছিল। কাকের দল যেভাবে চড়াই ছানাকে ঠোকরায়। জানত না, যাকে ওরা চড়াই ভেবেছিল সেটা আসলে ঈগল। আমাকে হাত লাগাতে হয়নি স্যার, একা পলাশই এদের পিটিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে, অন্যায় যারা করে আসলে তারা খুব দুর্বল। কাওয়ার্ড।'

বাংলার শিক্ষক মশাই বললেন, 'গুণ্ডামিও করবে আবার চ্যাটাং চ্যাটাং কথাও বলবে। মজা মন্দ নয়।'

বুলেট বললে, 'লেখাপড়াও করাবেন না, আবার শিক্ষকতার নামে রাজনীতি করবেন, মজাতো মন্দ নয়।'

বাংলার শিক্ষক নির্মল সামন্ত ঝট্ করে পা থেকে চটি খুলে বুলেটকে ছুঁড়ে মারলেন। বুলেট ক্যাচ ধরার কায়দায় জুতোটা লুফে নিয়ে বললে, 'এরপর আপনার সম্পর্কে এমন আর একটা কথা বলতে পারি যে, আপনি আর একপাটি জুতো ছুঁড়ে খালি পায়ে বাড়ি ফিরে যাবেন।'

নির্মলবাবু ভয়ে কেমন যেন সিঁটিয়ে গেলেন।

বুলেট বললে 'একটু বেশি রাতে আপনি যেখানে যান, আজ আমাদের দল নিয়ে সেইখানে যাব, জুতোটা ওইখানেই পাবেন। আর এই ছেলেদের পকেট, হেডস্যার আপনিই সার্চ করুন। অনেক কিছু পাবেন। পুরিয়াও আছে। এই যে যার নাকটা শুয়ে পড়েছে এই হল পুরিয়ার সাপ্লায়ার।'

শংকর পালাবার চেষ্টা করছিল, বুলেট খপ করে হাতটা চেপে ধরল।

হেডমাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করলেন, 'পুরিয়া কী জিনিস?'

'সেই জিনিস স্যার, ড্রাগস।'

'ড্রাগস!' হেডমাস্টারমশাই আঁতকে উঠলেন।

বুলেট বললে, 'স্যার নিজেদের চরিত্র আগে ঠিক করুন, তারপর ছাত্রদের শেখাবার চেষ্টা করবেন। পলাশ, চলে আয়। এই স্কুলে আমরা আর আসছি না স্যার! আপনাদের দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। এটা আর স্কুল নেই বদমাইশির আখড়া!'

আমরা দু'জনে বেরিয়ে এলুম স্কুল থেকে। কত দিনের পুরনো স্কুল, সেই স্কুলের আজ কী দশা! আমরা বুলেটের গুহায় এসে ঢুকলুম। বুলেট তার কম্বলের আসনে বসে বললে, 'তোকে যদি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয় তাহলে কী করবি!'

'তাড়িয়ে দেবে কেন!

'অনিমেষের বাবা, শংকরের বাবা তোদের বাড়িতে যাবেই যাবে।'

'তাহলে আমি আগেই গিয়ে যা যা হয়েছে সব বলে রাখি।'

'ওরা না এলেও তোকে বলতে হবে। আমরা নতুন স্কুলে ভর্তি হব।'

'কোন স্কুল? ঠিক করেছিস কিছু?'

'হরিসাধন বিদ্যাপীঠ।'

'ভাল স্কুল?'

'রামকৃষ্ণ মিশনের স্টাইলে করেছে

'তুই ফার্স্ট বয় তোকে নেবে, আমায় নেবে কেন?'

'সেটা আমার দায়িত্ব।'

বুলেটের কাছে কিছুক্ষণ থেকে বাড়ি মুখো হলুম। ভয়ে-ভয়ে এগোচ্ছি। হয় তো দেখব বাড়ির সামনে বিশাল ভিড়! না, সব ফাঁকা। আমাকে পাড়ায় ঢুকতে দেখে চায়ের দোকানের বাচ্চা ছেলে ফটিকটা সুট করে বেরিয়ে এল। অন্ধকারে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে বললে, 'তুমি কী করেছ?'

'কেন রে?'

'দোকানের পেছনে দুটো ছেলে তোমার জন্যে লুকিয়ে আছে।'

'কেন, চোর-চোর খেলবে?'

'চোর-চোর খেলবে না, তোমাকে মারবে! আমি ওদের কথা শুনে ফেলেছি।'

'ছেলে দুটোকে চিনিস! আগে দেখেছিস কখনো!'

'একটাকে দেখেছি, আরেকটাকে দেখিনি কখনো। বেশ ভারি চেহারা। বলছে, তোমাকে না কী সারা-জীবনের মতো জখম করে দেবে। তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যাও। আজ আর বেরিয়ো না। কী হল না হল তোমাকে আমি খবর দোবো।"

'তুই বুলেটকে চিনিস?'

'চিনি।'

'একটু পরে একবার আসবি? একটা চিঠি তোর হাত দিয়ে বুলেটের কাছে পাঠাব।'

'লিখে রাখ। আমি আসছি একটু পরে।'

একটু যেন ভয় পেয়ে গেলুম। এবার তো আর ঘুসোঘুসি লড়াই হবে না। ওরা সাইকেলের চেন, ছুরি, বোমা সবই বের করবে। একা আমি সামলাতে পারব না। বাড়িতে এসে সোজা আমার ছাতের ঘরে চলে গেলুম। বুলেটকে লিখলুম, 'ওরা দু-তিনজন মাস্তান পাঠিয়েছে বুলেট। ফটিকের চায়ের দোকানের পেছনে ঘাপটি মেরে বসে আছে। এখন কী করব শিগগির লিখে পাঠা। বাড়িতে বোম চার্জ করতে পারে।'

ফটিক এক ফাঁকে এসে চিঠিটা নিয়ে গেল। মা বললে, 'অমন গুম মেরে বসে আছিস কেন? শরীর খারাপ?'

মাকে আমি সব কথা বলি। না বলে থাকতে পারি না। স্কুলে যা যা হয়েছে, সব খুলে বললুম। ফটিকের দোকানের পেছনে যারা আছে তাদের কথাও বললুম। মা একটু চিন্তা করে বললে, 'ভয় পাসনি। প্রয়োজন হলে আমি বেরবো। দেখি ওদের কত সাহস।'

আধ ঘণ্টার মধ্যে বুলেট এসে গেল, সঙ্গে হারু। হারুকে আমি চিনি। শরীরে অসুরের শক্তি। তবে ছুরি, চেন, বোমার সামনে কি করবে, সেটা জানি না।

বুলেট বললে, 'শয়তানদের সঙ্গে শয়তানি করতে হয়, আর যুদ্ধ জেতার নিয়ম হল, মারার আগে মার।'

'মারবি কি করে? ওরা তো তৈরি।'

'আমরাও তৈরি। হারুর কাছে রিভলভার আছে। তবে ব্যাপারটা নিঃশব্দে করতে চাইছি আমি।'

'নিঃশব্দে করবি কি করে? বোমা ছুঁড়লেই তো শব্দ হবে।'

'তুই শুধু আমাদের সঙ্গে আয়। দেখ আমরা কী করি।'

কী করবে কে জানে! বুলেটের ব্যাপারটাই আলাদা। প্রশ্ন করলেও উত্তর দেবে না। বুলেট আর হারু হন হন করে হাঁটছে। আমি পেছন পেছন। ভয় যে একটা করছে না, তা নয়। পেছন দিক থেকে ঝড়াস করে মেরে দিলে কিছু করার নেই। তবু ভয় পেলে চলবে না।

বুলেট শঙ্করদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। জায়গাটা নির্জন। বাড়িটা বনেদী। বাইরে একটা পাথর লাগান। শঙ্করের ঠাকুরদার নাম। লেখা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। বুলেট হারুকে বললে, 'ডাক। আমরা একপাশে লুকোচ্ছি। তোর ডাকে বেরিয়ে আসবে।'

হারু ডাকছে, 'শঙ্ক, শঙ্ক।'

র বাদ, শঙ্করের র নেই। তিনবার ডাকতেই রাস্তার দিকের বারান্দায় শঙ্কর এসে দাঁড়াল, 'কে রে হারু!'

'নেমে আয়। শিগগির নেমে আয় নিচে।'

আমি আর বুলেট আরো একটু আড়ালে সরে গেলুম। রাস্তাটা এই জায়গায় একটু বাঁক নিয়েছে। আমরা সেই বাঁকের আড়ালে। শঙ্কর বেরিয়ে

এসেছে রাস্তায়। শংকর বলছে, 'পলাশ আজ টেরিফিক মেরেছে, সঙ্গে বুলেট ছিল।'

হারু বললে, 'খুব বেড়েছে। এইবার একটু টাইট দিতে হবে।'

'সে ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আজ রাতেই টাইট হবে।'

'কী, একেবারে জানে খতম!'

'সে ওরা জানে।'

'কারা?'

'বিজু আর পরেশ।'

'তুই ওই শয়তান দুটোর সঙ্গে মিশিস।'

'কেন, সে তো জানিস তুই।'

'ও হ্যাঁ, বুঝেছি। পুরিয়া তো।'

'পুরিয়া।'

হারু শংকরের সঙ্গে চায়ের দোকানের পেছনের অন্ধকার জায়গাটায় ঢুকতেই আমি আর বুলেট পজিসান নিয়ে নিলুম। বিজু আর পরেশ এগিয়ে এল। এত অন্ধকার যে কেউ কারোকে চিনতে পারছে না। হারু আর শংকরকে ভেবেছে, আমি আর বুলেট।

শংকর চিৎকার করে উঠল, 'অ্যায় কী হচ্ছে! আমি শংকর।'

হারু একটা সিটি মারল। সঙ্গে সঙ্গে আমরা পেছন দিক থেকে শংকরকে চেপে ধরলুম।

শংকর বললে, 'অ্যায় এসব কী হচ্ছে!'

হারু বললে, 'কী আবার হবে। তোকে একটু কাতুকুতু দেওয়া হবে। মাসখানেক হাসপাতালে শুয়ে থাকবি। তারপর জোড়াতাপ্পি লাগিয়ে ছেড়ে দেবে।'

শংকরের টুঁটিটা হারু চেপে ধরেছে। শংকর কথা বলতে পারছে না।

হারু বলছে, 'যদি বাঁচতে চাস ওদের বল, মাল আমার পায়ের কাছে জমা করে দিয়ে চলে যেতে। পলাশ আর বুলেটের কিছু হলে, তোকে আর তোদের বাড়ির সবকটাকে হাসপাতালে পাঠাব।'

শংকর কোঁক করে একটা শব্দ করল। হারুর হাতের কায়দা! আমরা এক ঝটকায় শংকরকে বেশ কিছুটা পেছনে সরিয়ে আনলুম। শংকর এখন আমাদের হাতে বন্দী। শয়তান দুটো অন্ধকারে বোকার মতো দাঁড়িয়ে

আছে। হারু বলছে, 'তোদের ফ্যামিলির একটা সুনাম ছিল শংকর। সেটাকে তুই শেষ করে দিলি!'

শংকর বললে, 'তোরা চলে যা।'

বিজু আর পরেশ অন্ধকারে মিশে গেল!

শংকর বললে, 'এইবার তাহলে আমাকে ছেড়ে দে।'

হারু বললে, 'আমরা পাঁঠা নই। তোকে আমরা এক মাসের জন্যে লোপাট করে দোবো। তুই নিরুদ্দেশ হয়ে যাবি।'

শংকর বললে, 'বন্ধু হয়ে এই রকম করবি?'

'তুই করতে বাধ্য করছিস বলেই করব। তুই এখন আমার শত্রু, কারণ তুই আমার বন্ধুদের মারার ব্যবস্থা করেছিলিস। এখন এক মাসের জন্যে তোকে আমরা গুম করে রাখব। সেই সময়ের মধ্যে ওদের ঝাড়বংশ এই এলাকা থেকে উচ্ছেদ করব। তোর বাবা মাকে বলে আসব, ছেলে কাদের সঙ্গে মিশত, কী করত, পুরিয়া কাকে বলে! পয়সা কোথা থেকে পায়! এক মাসের জন্যে ছেলে আমাদের নার্সিং হোমে রইল। ব্রেকফাস্ট সাত ঘা চাবুক। লাঞ্চ গরম ইস্ত্রির ছেঁকা। ডিনার, মাটিতে ফেলে দলাই মালাই। সারাদিন একটা ক্যাম্প খাটে তোকে বেঁধে রাখা হবে। খুব একটা খারাপ লাগবে না। কী বলি!'

শংকর রাগে গড়গড় করছে। জিগ্যেস করলে, 'তুই নিজে কী?'

আমি খুব খারাপ। জন্ম থেকেই খারাপ! কিন্তু কেউ ভাল থেকে খারাপ হয়ে যাবে, সে আমি সহ্য করব না। তোকে পিটিয়ে পিটিয়ে আবার বাপের অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হবে, আর যারা দুটো পয়সার জন্যে তোদের মতো ছেলেদের নষ্ট করছে তাদের পিঠের চামড়া ছাড়িয়ে ডুগডুগি বাজান হবে।'

'ওরা দলে ভারি, তোকে মেরে ফেলবে।'

'তোকে ভাল করতে গিয়ে যদি মরতে হয় তো মরব। চোখের সামনে দেখতে পারব না, তুই গেলি তোদের বাড়ি ঘর সব গেল। তোর বাবা পথে পথে ঘুরছে। তুই না করতে পারিস, আমরা সবাই তোর বাবাকে শ্রদ্ধা করি। তার ঠাকুরদা স্বদেশী করতেন। সেই বংশের ছেলে তুই। কী করে ভুলে গেলি শংকর!'

এই সব কথা হচ্ছিল ফটিকের চায়ের দোকানের কোণে বসে। শংকর

অসহায়ের মতো আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমি কী ভাল হতে পারব বুলেট ?'

বুলেট শঙ্করের পিঠে হাত রেখে বললে, 'আমি কী করে ভাল হলুম শঙ্কর। আমি তো সত্যিই খারাপ ছিলুম।'

'বুলেট, তুই খারাপ ছিলিস না, তুই ছিলিস দুর্দান্ত। আমি খারাপ। আমি পয়সা চুরি করে নেশা করি।'

বুলেট বললে, 'আর করবি না, সেইটাই তোর মনের জোর।'

শঙ্কর খুব বিষণ্ণ হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। মনে হল শঙ্কর তার ভুল বুঝতে পেরেছে। একটা অনুশোচনা এসেছে। তবে শুনেছি, নেশা একবার ধরলে আর ছাড়া যায় না। একমাত্র মৃত্যুতেই মুক্তি।

হারু বললে, 'যা বাড়ি যা। চেষ্টা করে দেখ যদি ভাল হতে পারিস।'

॥ ৮ ॥

যে সব ঘটনা ঘটে গেল, সে সব তো পিয়ালিকে জানাতে হয়। আমি যে ঘুসি চালাতে পারি, মারামারি করতে পারি পিয়ালি জানবে না! তা কী হতে পারে! সে আমার কত আপন! জানি আমার চিঠির উত্তর সে দেবে না, তবু আমি তাকে লিখব।

মা মশারির মধ্যে শুয়ে ছিল। জিজ্ঞেস করলুম, 'পিয়ালিরা আসবে না মা? তুমি যে বলেছিলে!'

'কী জানি! এখন শুনছি আসবে না।'

'কেন আসবে না?'

'আমি কেমন করে বলব বল্! আমি কী ওদের বাড়ি যাই!'

'একবার গিয়ে খবরটা নিতে পার তো!'

'পিয়ালি, পিয়ালি না করে শুয়ে পড়, অনেক রাত হয়েছে।'

আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লুম। দূরে বড় রাস্তা। রাত কাঁপিয়ে লরি ছুটছে। ভারি ভারি লরির ইঞ্জিনের শব্দ। বড় রাস্তার ধারে একটা কারখানা আছে। লোহার হাতুড়ি টোকার শব্দ। কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে উঠে পড়লুম। মা ঘুমিয়ে পড়েছে। টেবিল ল্যাম্পটাকে আড়ালে রেখে লিখতে বসলুম পিয়ালিকে।

সেই দিনের কথা মনে আছে। আমরা বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছি। তিন চারটে লরিতে আমাদের সব মাল উঠেছে। আমাদের একশো বছরের বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি দূরে, ঘিঞ্জি একটা জায়গায়, যেখানে অনেক লোক, সারাদিন অনেক গাড়ি, দোকানপাট, কলকোলাহল। যেখানে গাছ নেই, পরিষ্কার বাতাস নেই। সারাদিন একটা কারখানার চিমনি ভুস্‌ভুস্‌ ভুসো ধোঁয়া ছাড়ে আকাশে।

কতদিন হয়ে গেল, সেইসব দিনের কথা। যেখানে আমাদের বাড়িটা ছিল সেখানে এখন গঙ্গা। একটা ফেরিঘাট হয়েছে। কত যাত্রী রোজ এপার ওপার করে। আর দাদুর ঘরটা যেখানে ছিল, সেইখানে হয়েছে টিকিটঘর। পারে যাওয়ার টিকিট মেলে সেই ঘরে।

॥ ৮ ॥

গল্পটা পড়া শেষ হল। বুলেট চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কেমন লাগল তোর ?'

'এতটা ভাল লিখবি, আশা করিনি।'

'আমি একটা কাগজ বের করব।'

'কাগজ বের করবি কেন ?'

'মনের কথা খুলে বলব বলে। কাগজটার নাম হবে 'বুলেট।' মাসিক কাগজ। সাহিত্য আর বিজ্ঞান দুইই থাকবে।'

কাটা ?'

'টাকা আমার আছে।'

'লেখা পড়া ?'

'যে রান্না করে সে কী চুল বাঁধে না ?'

'বিজ্ঞাপন ছাড়া কাগজ চলবে ?'

বিজ্ঞাপন আমি পাব। বিজ্ঞাপনের চেয়ে বড় হল ভাল লেখক। আমার যত দূর ধারণা, তোর মধ্যে লেখা আছে। দেখ, কোনো কিছু সৃষ্টি করার আনন্দ, আর কিছুতেই নেই। মানুষ তোর লেখা পড়বে, ভাববে, আনন্দ পাবে, তোকে ভালবাসবে, এর চেয়ে বড় কথা আর কী আছে !'

'তুই কী নিজের প্রচার চাইছিস ?'

'কেন ? এ কথা বলছিস কেন ?'

'বুলেট, নাম রাখছিস কেন ? নিজের নাম ?'

'নিজেকে ভালবাসি বলে। মানুষ তো নিজেকেই সব চেয়ে বেশি ভালবাসে। নিজের সুখ, নিজের ভোগ, নিজের প্রচার, যশ, খ্যাতি। পৃথিবীতে আমি ছাড়া আর কে আছে এত ভালবাসার! কেউ নেই।'

কথা বলতে বলতে বুলেট একটা দেশলাই আর বড় মোমবাতি বের করল। কী করতে চাইছে কে জানে। একটা আড়ালে বাতিটা জ্বেলে বসাল। শিখাটা অল্প কাঁপলেও বেশ জ্বলছে। বুলেটের গুহাঘর একটু অন্ধকার মতো, তাই দিনের বেলা হলেও বাতিটা বেশ খুলেছে। বুলেট বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ আমার লেখা গল্পটা সেই আগুনে ধরল। একটা পাশ জ্বলছে।

আর্তনাদ করে উঠলুম এ কী করছিস তুই?'

বুলেট হাসতে হাসতে বললে, 'তোর ভালবাসাকে চিতায় চড়ালুম।'

'আমার খে আর কপি নেই বুলেট।'

'কোনো সৃষ্টিরই কপি হয় না। তোর আমার, তার কারো কোনো কপি নেই।'

'আমাকে দিয়ে লেখালি, আবার পুড়িয়ে ফেললি, এই খেলার কী মানে?'

'মানে এই আবার লিখবি। আবার পোড়াবি। আবার লিখবি। এই করতে করতে তোর মধ্যে একটা অনাসক্ত, নিস্পৃহ, উদাসীন ভাব আসেবে। এই জগৎ যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি সবেতেই আছেন, আবার কোনো কিছুতেই নেই। ছেলে মানুষের মত। হীরে-কাঁচ সবই তাঁর কাছে সমান।'

'আমাকে এইসব শেখাচ্ছিস কেন?'

'একটাই কারণ, তোর পিয়ালিকে পোড়াতে হবে। তোর ভালবাসার গল্প। সেই গল্পটা কাগজে লেখা একটা পাণ্ডুলিপি নয়, তোর মনে লেখা হয়ে আছে।'

ভালবাসা পোড়াব।'

'হ্যাঁ, পোড়াবি। মানুষকে ভালবাসলে দুঃখ পেতে হয়। জীবনটা নষ্ট হয়ে যায়। সাধারণ হয়ে যায়। ভালবাসা শব্দটাই আছে। মানুষে মানুষে ভালবাসা নেই। আছে স্বার্থ; তুই তো আমার চেলা?'

'হ্যাঁ, আমি তোর চেলা। সব ব্যাপারেই তুই আমার গুরু।'

'তাহলে তুই কেন হ্যাংলার মতো একটা মেয়ের পেছনে ঘুরে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবি! মেয়ে মানে কী, কখনো ভেবেছিস?'

'না রে!'

'নরম একটা শরীর। দেহে ফুলের গন্ধ। সরু মিষ্টি কণ্ঠস্বর। মমতা, সেবা, মাতৃত্ব, বশ্যতা স্নেহ। ঘাস কী নরম নয়, জল কী তরল নয়, পাখির ডাক কী মিষ্টি নয়, গাছ কী গ্রীষ্মের দুপুরে শীতল ছায়া দেয় না. বাতাস কী সেবা করেনা, সকলের মা, সবার মা কী, পৃথিবী নয়। মানুষ কী স্বভাবের বশ নয়, সূর্য কী উত্তাপ আর উষ্ণতা দিয়ে আমাদের স্নেহ করে না। তবে রবীন্দ্রনাথকে শোন,

ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহ মোহ বন্ধন—
ওরে' আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।
ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা বসে ক্রন্দন—
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুলশেজ-রচনা।
আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ-অঙ্গন
উষা-দিশাহারা নিবিড়-তিমির-আঁকা।

আমাদের আদর্শ হল সন্ন্যাস। সংসারে আমরা পচে মরব কেন! একটা ছোট ঘর কাচ্চ-বাচ্চা, ট্যাঁ-ভ্যাঁ। ছোট সুখ, ছোট দুঃখ। এই সব আমাদের জন্যে নয়। আমাদের জন্যে এই বিশাল পৃথিবী, আকাশ. বাতাস। আমাদের ভালবাসা জীবজগৎ. মানুষ। আমরা স্বামীজির চেলা।'

ঘরের কোণে আমার প্রথম রচনা, গল্পের ছাই ফুরফুর করছে। সেদিকে তাকিয়ে মন আর তেমন খারাপ হচ্ছে না। কী আছে! লিখেছি, চেষ্টা করলে আবার লিখতে পারব। স্বামীজির ছবির সামনে বুলেট বসে আছে, যেন আর এক স্বামীজি। সেই তেজ, সেই সাহস, সেই জ্ঞান যেন ধীরে ধীরে জাগছে। বুলেট বললে, 'আসল কথাটা শোন,

হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শংকর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ. তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয় সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলি প্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি মূর্খ, দরিদ্র অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই. বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চন্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া

বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন-রাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা—কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'

বুলেট বুলেটের মতো ঢুকে গেল আমার বুকে। সত্যই তো, নারীর প্রেম থেকেই তো সংসারের যাবতীয় বন্ধন।

সময় তো স্থির থাকবে না। নদীর মতো বহে চলেছে তরতর করে। স্কুলের জীবন শেষ হয়ে গেল। বুলেট আমাদের স্তম্ভিত করে দিয়েছে। বুলেট ফার্স্ট। স্বামী বিবেকানন্দের প্রেসক্রিপসান। প্রথমত তোমাকে ব্রহ্মচারী হতে হবে। সংযম অভ্যাস করতে হবে। তৈরি হবে ওজ। ওজ থেকে মেধা। মেধা তৈরি হলে বেড়ে যাবে স্মৃতি। যা পড়বে তাই তোমার মনে থাকবে। তোমার বোধ ও বুদ্ধি বেড়ে যাবে। বুলেট তার প্রমাণ। উজ্জ্বল কান্তি, দীপ্ত জ্যোতি। আমার রেজাল্ট বুলেটের মতো না হলেও খারাপ হল না। আরো ভাল হতে পারত, নিজের রোমান্টিক স্বভাবের জন্যে কিছুটা গেল। পিয়ালি অনেকটা অধিকার করে আছে। মনে মনে কল্পনার ছবি এঁকে যাই। স্বপ্নের মতো কোনো শহরে ছবির মতো বাড়ি। দুঃখ নেই, অভাব নেই। আলো, হাসি, গান। ফিল্টার করা জলের মতো পরিশ্রুত টলটলে জীবন। সাফল্যে ভরা। পিয়ালি পরীর মতো সবুজে নেচে বেড়ায়। আমরা ফল খাই, ফুলের গন্ধ শুঁকি। এই সব ভাবতে ভাবতে প্রকৃত জীবন থেকে আমি সরে যাই অনেক সময়। সেইটাই আমার চরিত্রের দোষ। পিয়ালিরও সেই একই স্বভাব। সংসারে থেকেও সংসারে নেই। থেকে থেকে বলবে, পলাশ, আমরা এমন একটা দেশে যাব, যেখানে সারা বছরই বরফ পড়বে। রোজ সকালে কোদাল দিয়ে বরফ সরিয়ে দরজা খুলব। জানলার কাঁচে বরফের শিকলি ঝুলবে সুন্দরীর নাকের নোলকের মতো। যখন রোদ উঠবে তখন বরফ গলে গলে পড়বে মুক্তোর দানার মতো ফোঁটা ফোঁটা।

জীবন যেন এক স্বপ্ন। স্কুলের পর বুলেটের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। বুলেট গেল প্রেসিডেনসিতে আমি স্কটিশে। স্কটিশে যাওয়ার কারণ, আমাদের পরিবারের সবাই স্কটিশে পড়েছেন। আমার ঠাকুরদা যখন পড়তেন,

তখন নাম ছিল, জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশান। পিয়ালি গেল বেথুনে। অনেক সময় আমরা একসঙ্গে বাড়ি ফিরতুম। ট্রামে—বাসে না উঠে, একসঙ্গে গল্প করতে করতে হাঁটতুম। এমন গল্প যে, আমাদের কোনো খেয়াল থাকত না, কোথায় আছি, পাশ দিয়ে যাচ্ছে কারা। পাগলী পিয়ালি হাত নাড়ছে, হিহি করে হাসছে। কখনো আমার খুব কাছে সরে আসছে, কখনো ছিটকে দূরে চলে যাচ্ছে। একবার এক হাসিখুশি অবাঙালি ভদ্রলোক আমাদের দেখে বলেছিলেন—"দিস ইজ দি বেনিফিট অফ বিইং ইয়ং!" যুবক হওয়ার এই সুখ। পৃথিবীর গতানুগতিক দুঃখ-সুখ সেইভাবে চেপে ধরতে পারে না। স্থানকাল পাত্র ভুলে আমরা আবার ভুয়েটে গান গাইতুম,

এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না।
মন উড়েছে উড়ুক-না রে মেলে দিয়ে গানের পাখ্না॥
আজকে আমার প্রাণ ফোয়ারার সুর ছুটেছে,

সবাই তাকাচ্ছে। হাঁ করে দেখছে। দেখুক। আমরা দু'জনেই কিছুটা বেপরোয়া ছিলুম। ভেতরে পাপ না থাকলে এই রকম খোলামেলা হওয়া যায়। এটা আমাদের গুরু বুলেট শিখিয়েছিল। দরজা জানলা সব খুলে দে। গোপনীয়তাই পাপ, সংকীর্ণতাই মৃত্যু, হিংসাই ম্যালেরিয়া।

দিন সত্যিই চলে গেল। পিয়ালি ফাইনালের আগেই জ্বরে পড়ল। প্রথমে সামান্য জ্বর। কে আর মাথা ঘামায়। হয়েছে সেরে যাবে। দু'এক পুরিয়া ওষুধ খেল। কেঁপে জ্বর আসে ঘাম দিয়ে ছাড়ে আবার আসে। জ্বর ক্রমে বাড়তে থাকে। তিন, চার। সে আর ছাড়ে না। শেষে ডাক্তার-বাবুরা বললেন এ হল ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া। বুলেট লেখাপড়া বন্ধ রেখে তার গুহাঘর থেকে বেরিয়ে এল। পিয়ালির পাশে তার হাত ধরে বসে থাকি। একপাশে বুলেট, আর একপাশে আমি। যেন ধরে থাকলে মৃত্যু এসে নিয়ে যেতে পারবে না। পিয়ালির রঙটা হয়ে গেছে হলুদ। একদিন ডাক্তারবাবু ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'আশা খুব কম। জন্ডিস স্টার্ট করে গেছে।'

বুলেট কখনো কাঁদেনি। সেই প্রথম বুলেটকে আমি কাঁদতে দেখেছিলুম। আমার বুকে মাথা রেখে বুলেট কাঁদছে। বুলেটও পিয়ালিকে ভালবেসেছিল। গভীর ভালবাসা। কোনদিন বুঝতে দেয়নি কারোকে। পিয়ালি আমাদের

সঙ্গে শেষ যে কথা বলেছিল, 'ওই কবিতাটা একটু শোনাবি, হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি।'

বুলেট বললে, আমি শোনাচ্ছি,

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকার মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি, বিম্বসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

এই কবিতা শুনতে শুনতে পিয়ালি চলে গেল, দূরে কোনো যাত্রাপথে। বুলেট একটা কথাই বলেছিল, 'যাঃ ঘুড়ি কেটে গেল। বুলেট ওই কবিতাটাই শেষ করল রবীন্দ্রনাথ দিয়ে,

শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে ?
আঘাত হয়ে দেখা দিল, আগুন হয়ে জ্বলবে।।

বুলেট কেমিস্ট্রিতে ফার্স্ট'ক্লাস ফার্স্ট হয়ে এম এম সি পাশ করল। ভেবেছিলুম, আমেরিকায় যাবে রিসার্চ করতে। হঠাৎ বুলেট একদিন নিরুদ্দেশ। কোথায় গেল, কোনো সন্ধান নেই। পরে খোঁজ পাওয়া গেল, বুলেট সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। যে সবচেয়ে বড় প্রেমিক সেই তো সন্ন্যাসী।

আমেরিকা চলে গেলুম আমি। কী হবে সেই দেশে থেকে যেদেশের সর্বত্র স্মৃতি ছড়ানো। বুলেট নেই, পিয়ালি নেই, আমার মাস্টারমশাইরা নেই। আমার সেই প্রাণের স্কুল, সেও এক শ্মশান।

অনেকদিন পরে আমি আমার ছেলেবেলার জায়গায় ফিরে এলুম। আমি এখন দূর বিদেশে আমেরিকায় থাকি। কি করব ? ভাগ্য আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই তো যেতে হবে। কয়েকদিনের জন্যে এসেছি, মন ভীষণ টানল, তাই চলে এলুম। এখানে আমার আপনজন কেউ থাকে না। সবাই মারা গেছেন। আমার বাবা, মা, জ্যাঠামশাই, জেঠিমা,। কেউ আর বেঁচে নেই। এক একটা পরিবার এইরকম থাকে, যে পরিবারের সবাই মারা যায়। তাদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সবাই। একসঙ্গে এক জায়গায় বসে সব গল্প হবে, মুড়ি, তেলেভাজা খাওয়া হবে, ঠাকুরঘরে পুজোর ঘণ্টা বাজবে, রান্নাঘর থেকে ভাল গন্ধ ভেসে আসবে। এইসব সুখ তাদের কপালে লেখা নেই। মৃত্যু

আমার জীবন থেকে সকলকে কেড়ে নিয়ে গেছে। এই বিশাল পৃথিবীতে আমি একেবারে একা। আমার কিছুই নেই, আছে একগাদা গল্প। বাবার গল্প, মায়ের গল্প, আমার পিয়ালির গল্প। বড় করুণ সেই সব গল্প, বুকের মধ্যে লিখে রেখেছি।

ছেলেবেলার জায়গাটা তো গঙ্গার ধারে। সেই গঙ্গার ধারেই তো আমাদের সেই স্কুল। খুব পুরনো স্কুল। স্কুলটা এখনো আছে; কিন্তু এ কী অবস্থা! বাড়িটায় কত দিন রং পড়েনি। এখন গ্রীষ্মের ছুটি চলছে। গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলুম। বাধা দেওয়ার কেউ নেই। সামনেই সেই দরোয়ানের ঘর। তালা বন্ধ। আমি যখন ছাত্র ছিলুম তখন এই ঘরে রামাধর থাকত আর থাকত তার ভাই কেশোরাম। দু'জনেই ভীষণ ভাল ছিল। গরমকালে আমাদের মর্নিং স্কুল হতো। গেটের দু'দিকে দুটো চাঁপা গাছ ছিল। ভোরে তার কী সুগন্ধ! গাছ দুটো এখন আর নেই। রামাধর, কেশোরামেরও থাকার কথা নয়। তারাও এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। গেটের পাশে রামাধর ছোলা—কাবলি বিক্রি করত। বাবা রোজ আমাকে এক আনা পয়সা দিতেন। সেই এক আনায় ছোলা কাবলি হতো কাঁচা শালপাতায়। ঝালঝাল, পেঁয়াজ-টেঁয়াজ দেওয়া। স্বাদটা এখনো মুখে লেগে আছে। ছেলেবেলার খাওয়া তো ভোলা যায় না। এখন মর্নিং স্কুল নেই, রামাধর নেই, ছোলা—কাবলি খাওয়ার ছেলেও নেই। যুগ পাল্টে গেছে। বড় শান্ত, রামভক্ত মানুষ ছিল রামাধর। কেশোরামের বয়েস কম ছিল। সে সবসময় হাসত। বন্ধ ঘরটার দিকে তাকিয়ে তাদের কথা মনে পড়ে গেল। এই ঘরটায় এখন কেউ থাকে কি!

পাথর বাঁধানো ছোট্ট পথটুকু পেরিয়ে স্কুলের গাড়ি বারান্দার তলায় এসে দাঁড়ালুম। পরপর চারটে লম্বা চওড়া ধাপ। ভেঙেচুরে গেছে। অপরিষ্কার। কতদিন ঝাঁট পড়েনি। ডানপাশের দেয়ালে মার্বেল পাথরের ফলক। এই স্কুলের কৃতী ছাত্রদের নাম, পরবর্তী জীবনে যাঁরা গণ্যমান্য হয়েছেন। পঞ্চাশ সালের পর আর কারো নাম নেই। সেই ফলকটা পুরো পড়লুম। করিডর। দু'পাশে বড় বড় ক্লাসরুম। খড়খড়ি পাল্লার দরজা। ভেঙেচুরে গেছে। ভেতরে সার সার বেঞ্চ, হাইবেঞ্চ। ময়লা, ক্ষতবিক্ষত। জানলার ধারে ধারে কত বছরের আবর্জনার স্তূপ।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ঘোর লেগে গেল। মনে হলো ক্লাসরুম ছেলেতে

ভরে গেছে। সেকেণ্ড বেঞ্চের ধারে আমি বসে আছি আমার ডান পাশে বুলেট। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ক্লাস নিচ্ছেন কুমুদবাবু। প্রথমে রোলকল করছেন। ওয়ান, টু। যেই সেভেন বললেন, আমি অমনি দাঁড়িয়ে উঠে ইয়েস স্যার বলছি। বোর্ডে চক দিয়ে অঙ্ক লেখার খসখস শব্দ। টেবিলের ওপর ডাস্টার ঠোকার খটাস খটাস শব্দ। একটা সরল কর লিখেছেন। এখনি আমার ডাক পড়বে—বোর্ডে আয়। অঙ্কটা কর। করতে পারলে দু'চোখ ভরা আনন্দ নিয়ে তাকাবেন। ভেরি গুড। না পারলে দু'চোখে জল—এই সামান্য অঙ্কটা পারলি না! লেখাপড়া একেবারেই করছিস না রে! তোদের ক'জনের ওপর আমার যে বড় আশা ছিল রে!

হঠাৎ চটকটা ভেঙে গেল। কেউ কোথাও নেই। শূন্য, অপরিষ্কার ক্লাসরুম। ভ্যাপসা একটা গন্ধ। ব্ল্যাকবোর্ডটা হেলে আছে। ছুটির আগে খড়ি দিয়ে কে লিখে গেছে—'পার্থ পাঁঠা'। আমরাও এইসব লিখতুম। আমার এক সহপাঠী কিশোর তার কথা এই এখন মনে পড়ছে। ভীষণ ভাল কার্টুন আঁকত, শুনেছি সে এখন প্যারিসে আছে মস্ত বড় চাকরি করে, ফরেন সার্ভিস। কে জানত কিশোর এত বড় হবে. প্রায় রোজই ক্লাসে কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকত দুষ্টুমি করার অপরাধে। দুষ্টুমিতে কিশোর আর বুলেটের মাথা খুব খেলত। মাস্টারমশাইরা মেজাজ ভাল থাকলে বলতেন—তোদের মাথাটা যদি পড়ায় লাগাতে পারিস, তোদের আর আটকায় কে?

একদিনের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। কিশোরের ঠিক সামনে বসত সত্যেন। সত্যেনের স্বভাব ছিল শিক্ষকমশাই ক্লাস থেকে বেরুলেই সে কোন একটা প্রশ্ন নিয়ে, স্যার স্যার করে তাঁর পেছন পেছন যাওয়া। দেখাতে চাইত, সে কত উৎসাহী ভাল ছাত্র! কী ভীষণ তার জানার আগ্রহ! আমরা বলতুম, সত্যেনের একস্ট্রা কারিক্যুলার অ্যাটিভিটি। সেদিন ইতিহাসের ক্লাস শেষ হলো। দ্বিজেনবাবু ক্লাস থেকে বেরিয়ে করিডর ধরে দোতলার সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছেন, সত্যেন যথারীতি পেছনে ছুটছে। তার প্যান্টের পেছনের বগলসে লম্বা একটা দড়ি বাঁধা, সেই দড়ির শেষে একটা খালি টিনের কৌটো। কৌটোটা ঢ্যাং ঢ্যাং, ঠ্যাং ঠ্যাং শব্দে লাট খেতে খেতে চলেছে। যেন দমকল যাচ্ছে। ক্লাসসুদ্ধ সবাই হইহই করে হাসছে। দ্বিজেনবাবু পেছনে ওই শব্দ শুনে ভয়ে সিঁড়ির দিকে দৌড়চ্ছেন। কিশোর চিৎকার করছে, ফায়ার, ফায়ার। হেডমাস্টারমশাই হন্তদন্ত হয়ে নেমে এসেছেন। সত্যেন তখনো বাঝেনি ব্যাপারটা

কী। শব্দটা কেন হচ্ছে। ফায়ার ফায়ার শুনেছে। দ্বিজেনবাবু প্রাণভয়ে দৌড়চ্ছেন। এইবার সত্যেন নিজেই চিৎকার শুরু করল, আগুন, আগুন। সেই সিঁড়ি দিয়ে লাফাতে লাফাতে নামছে, আর খালি টিনের কৌটো আরো শব্দ করছে এইবার হেডমাস্টারমশাই সত্যেনের চুলের মুঠি ধরে বেধড়ক পেটানি শুরু করলেন। সত্যেন তারস্বরে চিৎকার করছে, আর বলছে, 'আমি কি করেছি স্যার, আমাকে কেন মারছেন, আমি তো স্যারের কাছে সিপাই বিদ্রোহের ভেতরের কথাটা জানতে আসছিলুম।' লেজে কৌটো বেঁধে সিপাই বিদ্রোহ! হনুমান। ছাগল।' আবার ধোলাই। রামাধর এসে সত্যেনকে বাঁচাল। পেছন থেকে দড়ি কৌটো খুলে দিল। কিশোর তখন ভীষণ মনোযোগী ছাত্র! ব্যাকরণ খুলে শব্দরূপ পড়ছে। পরের ক্লাসেই নির্মল বাবুর বাংলা ব্যাকরণ।

সেই সত্যেন এখন কোথায়! শুনেছি কোনো এক বড় কলেজে লাইব্রেরিয়ান হয়েছে। সরকারী চাকরি। সিঁড়ির দিয়ে এগিয়ে গেলুম। সিঁড়ির সেই বাঁক, যে বাঁকে দাঁড়িয়ে হেডমাস্টারমশাই সত্যেনকে পিটেছিলেন। মারটা খাওয়া উচিত ছিল কিশোরের। সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে কিশোর বেকসুর খালাস পেয়ে গেল। আমি রাজসাক্ষী হলে কিশোরের সাজা হতো। সত্যেনের পাকামি চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে গেল।

সিঁড়ির ধাপ, হাতল আর আগের মতো নেই। সর্বত্র দৈন্য আর অবহেলার ছাপ। বয়েস বেড়েছে জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। এত ছেলে তৈরি করেছে এই স্কুল, কেউ এই বৃদ্ধের সেবা করে না। সবাই সেই অর্থে কুপুত্র। দোতলার কোনো একটা ঘর থেকে টাইপরাইটারের শব্দ আসছে। এক সময় দেশের নামকরা বিখ্যাত শিক্ষক মহাশয়রা এখানে বসে গেছেন। বড় বড় পণ্ডিত। যশ, খ্যাতি, পুরস্কার, সরকারী অনুগ্রহ, কোনো কিছুর তোয়াক্কা করেননি তাঁরা। তাঁরা শুধু জ্ঞান দিয়ে, শিক্ষা দিয়ে ভাল ছাত্র তৈরি করতে চেয়েছিলেন। অতীতের সেই সব মহান শিক্ষকদের আমি দেখতে পাচ্ছি। ওই তো বসে আছেন, জীবনধনবাবু, বঙ্কিমবাবু, নির্মলবাবু, অনিলবাবু, ডঃ কাঞ্জিলাল, পণ্ডিত ভুজঙ্গবাবু। সবাই যেন একসঙ্গে বসে আছেন। সুপণ্ডিত নলিনীবাবু গম্ভীর মুখে আইনস্টাইনের থিওরি অফ রিলেটিভিটি নিয়ে কিছু বলছেন। সবাই গভীর আগ্রহে শুনছেন।

শীর্ণকায় এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। ভূত দেখার মতো

চমকে উঠে বললেন, 'কী চাই? এখানে কি করছেন? স্কুলের এখন ছুটি।'

'পঞ্চাশ বছর আগে এই স্কুলে আমি প্রথম ভর্তি হয়েছিলুম; তখন কাঞ্জিলাল স্যার হেডমাস্টারমশাই ছিলেন।'

'ছিলেন—ছিলেন। এখন আর তিনি এখানে থাকেন না।'

'সে আমি জানি। তিনি ভবপারে। আমি এখন বিদেশে থাকি। তিরিশ বছর পরে এসেছি, ভাবলুম পুরনো স্কুলটা একবার দেখে যাই। আপনি কী শিক্ষক?'

'আমি ক্লার্ক।'

আমাদের সময় পাঁচুবাবু ছিলেন হেডক্লার্ক। ভারি সুন্দর মানুষ ছিলেন। দেশে তাঁর অনেক নারকেল গাছ ছিল। আমাদের পুজোর পর স্কুল খুললে নারকেল নাড়ু খাওয়াতেন।'

'স্কুল দেখতে এসেছেন তাই তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'হাতে করে কিছু এনেছেন, সন্দেশ—টন্দেশ?'

'কই না তো!'

'কবে আক্কেল হবে? খালি হাতে গুরুজনের কাছে আসতে আছে? চা, কেক খাওয়ান।'

'কোথায় পাবো?'

'পয়সা ছাড়লেই পাওয়া যাবে। দশটা টাকা দিন'

'সে আমি দিচ্ছি দশ কেন পঞ্চাশ দিচ্ছি।'

'অত কাপ্তেনি ভাল নয়, বয়েসয়ে খরচ করতে হয়। দিনকাল ব্যাড, ভেরি ভেরি ব্যাড।'

'আপনার নামটা জানতে পারি?'

'আমার নাম মোহন মিত্র।'

মিত্তির একটা হুঙ্কার ছাড়লেন, 'জগা!' গণ্ডারের মতো তিরিশ-বত্রিশ বছরের এক ছোকরা যে-ঘরে টাইপ হচ্ছিল সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মোহনবাবু বললেন, 'যাও, চা আর খাস্তা নিমকি বিস্কুট নিয়ে এস। স্বাস্থ্য অবহেলা করো না। সুযোগ পেলেই খাবে। ইনি আমাদের এক স্টুডেন্ট। কি নাম আপনার?'

'পলাশ চ্যাটার্জি।'

'কি করেন ?'

'আমি আমেরিকায় চাকরি করি।'

'এই স্কুলের ছেলে আমেরিকায়। তাজ্জব কি বাত !'

'কেন স্কুলটা খারাপ না কী ? নিচের ওই মার্বেল ফলকের নামগুলো দেখেননি ?'

'দেখবো না কেন ? এ-দেশ হলো এক পিসের দেশ।'

'তার মানে ?'

'মানে সব ওয়ান পিস। এক পিস রবীন্দ্রনাথ, এক পিস স্বামিজি, এক পিস নজরুল, এক পিস শরৎচন্দ্র নেতাজী সুভাষ। ভাঙিয়ে যদ্দিন চলে। এ-বছর আমাদের রেজাল্ট জানেন ? সেন্ট পারসেন্ট।'

'সেন্ট পারসেন্ট পাশ !'

'আজ্ঞে না। সেন্ট পারসেন্ট ফেল। পকেটে বিলিতি সিগারেট নেই ?'

আছে।'

'চেপে রেখেছেন কেন ভাই ? মনটাকে সংকীর্ণ করবেন না। ওই জন্যেই বাঙালি তলিয়ে যাচ্ছে।'

এক প্যাকেট মার্লবো ছিল পকেটে, মোহন মিত্তিরকে প্যাকেটা দিতেই খুব খুশি। ঘরে গিয়ে বসেই সেই গানটা মনে পড়ল, ধুলোয় ধুলোয় ধুসর হব। এত ধুলো কল্পনা করা যায় না। পঞ্চাপ বছরের ধুলো। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'মোহনবাবু মাঝেসাঝে ঝাড়াঝাড়ি করলে কেমন হয়।'

'খুব খারাপ হয়। ধুলো মানেই ইনফেকসান, জার্ম। যত ঝাড়বেন ততো উড়বে। সাবধানে রেখে দিলে ক্ষতি নেই। পৃথিবীতে মশাই অনেক বড় বড় জিনিস আছে সামান্য ধুলো নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন ! বুঝেছি, বিদেশে থেকে আপনার বাতিক হয়েছে। এদেশে তো থাকতে পারবেন না। এখানে ধুলো, ধোঁয়া, কাদা, গর্ত, গোবর এই সব নিয়েই তো থাকতে হবে।'

মোহনবাবুকে বললুম, 'একবার হেডমাস্টারমশাইয়ের ঘরটা দেখাবেন ! আমার খুব প্রিয় ঘর ছিল।

'সে আর এমন কথা কী ! জগা ঘরটা খুলে দে।'

ঘরটা খোলামাত্রই বদ্ধ একটা বাতাস বেরিয়ে এল। শিক্ষার ডেডবডি থেকে পচা গন্ধ বেরোচ্ছে। আলমারিগুলো আছে, বই একখানাও নেই। ডানদিকের আলমারিতে ছিল এনসাইক্লোপেডিয়ার সেট। মোহন মিত্তিরকে

জিজ্ঞেস করে কোনো লাভ নেই। কিন্তু হেডমাস্টারমশাইয়ের সেই বিখ্যাত বড় চেয়ারটা কী হলো?

'সেই সুন্দর বড় চেয়ারটা? সেটা মাস্টারমশাইরা মারামারি করে ভেঙে ফেলেছেন।'

'মাস্টারমশাইরা মারামারি!'

'ও আপনি তো বিদেশে থাকেন, জানবেন কি করে? স্কুলে যে এখন রাজনীতি ঢুকেছে। ডান আর বাঁ, দু'হাতে এখন তালি বাজছে। আর ছাত্ররা ধরে সানাইয়ের পোঁ।'

আমি স্কুলের ছোট্ট খোলা মাঠে এসে দাঁড়ালুম। কতকালের প্রাচীন সেই বিশাল মেহগনি গাছটা এখনো আছে। এই গাছের তলায় আমি আর রুপেন কতদিন বসেছি। গল্প হচ্ছে তো হচ্ছেই। নলিনীবাবু আমাদের ভূগোলের নেশা ধরিয়ে দিয়েছিলেন। কত দেশ, কত মানুষ, কত নদী, পাহাড়, সমুদ্র। আমরা কল্পনায় সেই সব জায়গায় চলে যেতুম। ধীরে ধীরে সন্ধ্যে নেমে আসত। বিশাল উঁচু গাছ, মাথায় টিয়ার ঝাঁক।

গাছটার তলায় বসলুম। ভীষণ একা লাগল। কিশোর নেই, সন্তোন নেই, রুপেন নেই, তরুণ নেই, বুলেট নেই। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল, দেখি তো আছে কি না! মেহগনি গাছের ওধারে যে ধারটা পাঁচিলের দিকে, সেই ধারে একবার দোলের আগের দিন আমি আর বুলেট ছুরি দিয়ে আমাদের নাম খোদাই করেছিলুম। সেই বছরটাই ছিল আমাদের শেষ বছর। তার পর আমি আর বুলেট এই স্কুল ছেড়ে অন্য স্কুলে চলে যাই, দেখি তো সেই নাম দুটো আছে কি না! আশ্চর্য! নাম দুটো ঠিকই আছে—বুলেট-পলাশ। নাম দুটো পাশাপাশি, মানুষ দুটো কত দূরে! জীবনেও আর দেখা হবে না বুলেটের সঙ্গে।

যেখান থেকে শুরু হয় সেখানে এসে আর শেষ হয় না। জীবন নদীর মতো। সেই যে একবার চলতে বেরলো, আর ফেরার নাম নেই। সামনে, আরো সামনে। সমুদ্রে গিয়ে শেষ। হয়তো আর আমার দেশে ফেরা হবে না। পকেটে একটা ছুরি ছিল। বিদেশী ছুরি। বের করলুম সেটাকে। জানি পাগলামি, তবু সেই সেদিন যেমন খোদাই করেছিলুম, সেইভাবে ধরে ধরে লিখলুম—এসেছিলুম। বুলেট যদি কোনোদিন আসে, আর যদি মনে করে দেখে, তাহলে দেখবে আমি এসেছিলুম আমাদের ছেলেবেলায়। মনের দিক থেকে নিঃস্ব একটা মানুষ ফিরে চলে আবার বিদেশে।